এক চতুর্থাংশের বেশি রাজ্য কোন সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

(২) কংগ্রেস কোন সংশোধনী প্রস্তাব অঙ্গরাজ্যগুলির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে অস্বীকার করলে দুই তৃতীয়াংশ রাজ্য আইনসভার আবেদন ক্রমে কংগ্রেস একটি সাংবিধানিক কনভেনশন আহ্বান করতে বাধ্য। এই কনভেনশন সংশোধনী প্রস্তাবটিকে অনুমোদনের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভাগুলির কাছে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলে কংগ্রেস সেই সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য।

(৩) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতির বদলে বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা আমেরিকার সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থাটি সংবিধানটিকে দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতি দান করেছে।

(৪) সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবে তিন চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের সম্মতি আবশ্যিক ঘোষণা করা হলেও কতদিনের মধ্যে রাজ্যগুলিকে মতামত জানাতে হবে সে সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা হয় নি। সুপ্রীম কোর্ট এই সময়-সীমা নির্ধারণের দায়িত্ব কংগ্রেসকে দেওয়ায় বর্তমান প্রতিটি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যেই সময়সীমা স্থির করে দেওয়া হয়। কিন্তু কোন সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবে রাজ্যগুলির মতামত জ্ঞাপনের সময়সীমা যদি কংগ্রেস ঠিক করে না দেয়, সেক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সুপ্রীম কোর্ট কোলম্যান বনাম মিলারের মামলায় (১৯৩৯) রায় দিয়েছে যে এরূপ ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাবটি অনির্দিষ্টকাল রাজ্যগুলির কাছে পড়ে থাকবে।

(৫) কোন সংশোধনী প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যের গভর্ণরদের সম্মতি প্রয়োজন কিনা সে সম্পর্কে সংবিধান কিছু বলে নি। সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছে যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের আগে বা অনুমোদিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি বা গভর্ণরদের সম্মতির কোন প্রয়োজন নেই।

(৬) সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় গৃহীত হতে হয়। দুই-তৃতীয়াংশ বলতে মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ বা উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ — কোনটি হবে এ সম্বন্ধে সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছে যে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলতে উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশকে বোঝায়।

সমালোচনা ঃ মার্কিন সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতির নিম্নলিখিত সমালোচনাগুলি উল্লেখযোগ্য—

(i) মার্কিন সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল হওয়ায় তা যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে সক্ষম নয়। কংগ্রেসের দুটি কক্ষে দুটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে যে কোন সংশোধনী প্রস্তাবে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তিন-চতুর্থাংশ রাজ্য আইনসভার সম্মতি আদায়ও খুব সহজ নয়। তাই অনেক সমালোচক সংবিধান সংশোধনের আরও সহজ পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলেন।

(ii) অনুমোদনের জন্য সংশোধনী প্রস্তাবকে জনগণের কাছে পেশ করার বদলে রাজ্য আইন-সভাগুলির কাছে পেশ করাকে অনেকে অগণতান্ত্রিক মনে করেন।

(iii) সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব কংগ্রেস এবং ৩৭টি বৃহৎ রাজ্যের আইনসভা (অর্থাৎ তিন-চতুর্থাংশ থেকে একটি কম) দ্বারা অনুমোদিত হলেও কোন একটি সংশোধনী প্রস্তাব কার্যকর হতে পারে না। অর্থাৎ ৫০ টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে স্বল্প জনসংখ্যাবিশিষ্ট ছোট ১৩টি রাজ্যের আইনসভা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেকোন সংশোধনী প্রস্তাবকে বাতিল করে দিতে পারে।

(iv) সংশোধনী প্রস্তাবে রাজ্য আইনসভাগুলির মতামত জ্ঞাপনের কোন সময়সীমার উল্লেখ সংবিধানে না থাকায় অসুবিধা দেখা দেয়। কংগ্রেস সময়সীমা নির্ধারণ করে কোন প্রস্তাব না নিলে সংশোধনী প্রস্তাব রাজ্য আইনসভাগুলির কাছে অনির্দিষ্ট কাল পড়ে থাকতে পারে।

মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিটি জটিল ও কষ্টসাধ্য হওয়ায় দুশ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে এটি মাত্র ২৬ বার সংশোধিত হয়েছে। তবে বিচারালয়ের রায়, কংগ্রেস প্রণীত আইন, শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতি এবং শাসক প্রধানের যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে আমেরিকার সংবিধান সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

১০১.৬ বৃটেন ও আমেরিকার সংবিধানের তুলনা

ব্রিটেনও আমেরিকার সংবিধানের তুলনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

(i) ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত, কিন্তু আমেরিকার সংবিধান লিখিত।

(ii) ব্রিটেনের সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। এই সংবিধানকে পরিবর্তনের জন্য কোন জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতি বলতে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটকে বোঝায়। অর্থাৎ ব্রিটেনের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি নেই। কিন্তু আমেরিকার সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে (অর্থাৎ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে) এই সংবিধানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমেরিকার সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন।

(iii) ব্রিটেনে সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করা যায় বলে ব্রিটেনে সাংবিধানিক আইনের আলাদা কোন মর্যাদা নেই। কিন্তু আমেরিকায় সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতি থাকায় আমেরিকায় সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা সাধারণ আইনের ওপরে।

(iv) ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সার্বভৌম। তাই পার্লামেন্টের আইনগত ক্ষমতার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। পার্লামেন্ট যে কোন আইন প্রণয়ন বা বাতিল করতে পারে। আদালতের পার্লামেন্টের আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমেরিকায় পার্লামেন্টের আইন বা শাসনবিভাগীয় কাজের ওপর

আদালতের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আছে। সংবিধানবিরোধী বা ন্যায় নীতিবিরোধী যে কোন আইন বা শাসনবিভাগীয় কাজকে সুপ্রীম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে। অর্থাৎ ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পার্লামেন্টের প্রাধান্য আর আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগের প্রাধান্য দেখা যায়।

(v) ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি মানা হয় না। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরাই সেখানে মন্ত্রীসভা গঠন করে। রাজা বা রাণীও একদিকে শাসনবিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ, অন্যদিকে পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। লর্ড চ্যান্সেলর একাধারে মন্ত্রীপরিষদের সদস্য, লর্ডসভার সভাপতি এবং বিচারালয়ের একজন বিচারপতি। পার্লামেন্ট অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করলে মন্ত্রীদের পদচ্যুত হতে হয়। মন্ত্রীসভাও পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারে। কিন্তু মার্কিন সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে আইন, শাসন ও বিচারের ক্ষমতা যথাক্রমে কংগ্রেস, রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রীম কোর্টের হাতে। তিনটি বিভাগেই একে অন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের সদস্য হতে পারেন না, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে পারে না, আইনসভার কাছে দায়িত্বশীলও নয়।

(vi) ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টই আইনতঃ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। স্থানীয় সরকারগুলির অস্তিত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমেরিকার শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। এখানে সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে, নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে কাজ করে। কারো অস্তিত্ব অন্যের ওপর নির্ভর করে না।

(vii) ব্রিটেনের রাজা বা রাণী নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা ভোগ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ক্যাবিনেট। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসক — উভয় ধরণের ক্ষমতাই ভোগ করেন।

(viii) ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেট প্রকৃত শাসনক্ষমতা ভোগ করে। প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসক হিসাবে কাজ করার সময় ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের সহযোগিতা পান। কিন্তু প্রকৃত শাসক হিসাবে রাষ্ট্রপতির মতো কেউ নেই। রাষ্ট্রপতি একক শাসক। রাষ্ট্রপতি কাজের সুবিধার জন্য ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিয়োগ করেন। কিন্তু ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কোন সাংবিধানিক মর্যাদা নেই, তাঁরা রাষ্ট্রপতির ভৃত্যের মত। শাসনবিভাগের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতিকে একাকী বহন করতে হয়।

(ix) ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পার্লামেন্টারী, কিন্তু আমেরিকায় রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন প্রবর্তিত। তবে উভয় দেশেই উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত। উভয় দেশেই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা আছে এবং উভয় দেশেই জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ব্রিটেনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতি নির্ভর হলেও সেখানে প্রথা ও রীতিনীতির পাশাপাশি কিছু লিখিত পার্লামেন্ট রচিত আইনও আছে যেগুলি সাংবিধানিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আবার আমেরিকার সংবিধান লিখিত হলেও সেখানে কিছু অলিখিত প্রথা ও রীতিনীতি সাংবিধানিক

গুরুত্ব লাভ করেছে। যেমন ক্যাবিনেট প্রথা। তাই উভয় সংবিধানের কিছু পার্থক্য থাকলেও কিছু মিলও আছে।

১০১.৭ সারাংশ

আলোচ্য এককে আমেরিকার সংবিধানের রচনা, তার ঐতিহাসিক পটভূমি, সংবিধানের বিকাশের বিভিন্ন দিক, সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ও সংশোধন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিচালনা করে এবং ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৭৭৭ সালে তারা একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রসমবায় গঠন করে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা মেনে না নেওয়ায় যুদ্ধ চলে। শেষে ১৭৮৩ সালে ১৩টি উপনিবেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা লাভ করার পর তারা রাষ্ট্রসমবায়ের দুর্বলতা ও অনৈক্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নতুন সংবিধান রচনার জন্য ফিলাডেলফিয়ায় কনভেনশন ডাকে। ১৭৮৯ সালে আমেরিকার নতুন সংবিধান চালু করা হয়।

সংবিধানটি ছিল ক্ষুদ্র আকারের। পরে সংশোধন, বিচারে রায়, রীতিনীতি ও প্রথা, কংগ্রেস প্রণীত আইন ও রাষ্ট্রপতিদের সুযোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা সংবিধানটি বিস্তৃত ও বিকশিত হয়।

আমেরিকার সংবিধানটি লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি, জনগণের সার্বভৌমত্ব, যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রপতির শাসন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ইত্যাদি আমেরিকার সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।

আমেরিকার সংবিধানের সংশোধনব্যবস্থা জটিল। সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বা দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যগুলির অনুরোধে আহুত কনভেনশনে। সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয় যদি অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার তিন-চতুর্থাংশ সেই প্রস্তাব সমর্থন করে বা সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ্যগুলি দ্বারা আহুত কনভেনশনের তিন-চতুর্থাংশ সমর্থন করে। আমেরিকার সংবিধানটি দুষ্পরিবর্তনীয় এবং সংবিধান সংশোধনে রাজ্যগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয়েই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশ। উভয় দেশেই নাগরিক অধিকার স্বীকৃত, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ও দুটি রাজনৈতিক দল উভয় দেশেই দেখা যায়। তবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি শাসন আর ব্রিটেনের সংসদীয় শাসন। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেনে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা। আমেরিকার সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় আর ব্রিটের সংবিধান অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয়। তাই উভয় দেশের সংবিধানের মধ্যে পার্থক্যও বিস্তর।

আলোচ্য এককটি আপনাদের আমেরিকার শাসনব্যবস্থার মূল নীতিসমূহ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করবে।

১০১.৮ প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। আমেরিকার সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করুন।

২। আমেরিকার সংবিধানের বিকাশের বিভিন্ন উপায়গুলি কি কি ?

অথবা, কি কি উপায়ে আমেরিকার সংবিধান পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধানে সক্ষম হয়েছে?

৩। আমেরিকার সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ?

৪। আমেরিকার সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতিটি আলোচনা করুন।

৫। ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধানের পার্থক্যগুলি দেখান।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

ক) কবে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ?

খ) কবে আমেরিকায় রাষ্ট্রসমবায় গঠিত হয় ?

গ) কখন আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীন হয় ?

ঘ) কোন সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গৃহীত হয় ?

ঙ) আমেরিকার সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয় কেন ?

চ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি কিভাবে আমেরিকার সংবিধানে কার্যকর করা হয়েছে ?

ছ) নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি বলতে কি বোঝেন ? আমেরিকার সংবিধানে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি কিভাবে কার্যকর করা হয় ?

জ) আমেরিকায় বিচারবিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলতে কি বোঝেন ?

ঝ) আমেরিকায় কি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে ? কিভাবে ?

ঞ) আমেরিকার সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির একটি সমালোচনা লিখুন।

ট) ব্রিটেন ও আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় কী কী মিল দেখতে পাওয়া যায় ?

১০১.৯ উত্তরমালা

১। ৯৭.২ দেখুন।

২। ৯৭.৩ - এ উত্তর আছে।

৩। ৯৭.৪

৪। ৯৭.৫ দেখুন।

৫। ৯৭.৬

(ক) ৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬ সালে।

(খ) ১৭ই নভেম্বর, ১৭৭৭ সালে।

(গ) ১৭৮৩ সালে।

(ঘ) ১৭৮৯ সালে।

(ঙ) ৯৭.৪ - এর ৩ নং বৈশিষ্ট্যটি দেখুন

(চ) ৯৭.৪ - এর ৪নং বৈশিষ্ট্য

(ছ) ৯৭.৪ - এর ৫নং বৈশিষ্ট্য

(জ) ৯৭.৪ এর ৮ নং বৈশিষ্ট্য

(ঝ) হ্যাঁ। বাকী উত্তরের জন্য ৯৭.৪ এর ৯ নং বৈশিষ্ট্য দেখুন।

(ঞ) ৯৭.৫ - এর সমালোচনা অংশ থেকে যে কোন একটি লিখুন।

(ট) ৯৭.৬ এর শেষ পরিচ্ছেদ দেখুন।

১০১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Munro, W.B. : The Government of the United States.

২। Ogs, F.A & Ray, P.O : Essentials of American Government.

৩। Potter, Allen M : American Government and Politics.

৪। Beard, C.A. : American Government and Politics.

৫। অনাদিকুমার মহাপাত্র ঃ নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।

একক ১০২ ❑ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস

গঠন

১০২.০ উদ্দেশ্য

১০২.১ প্রস্তাবনা

১০২.২ রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা, কার্যকালের মেয়াদ ইত্যাদি

১০২.৩ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

১০২.৪ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১০২.৪.১ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

১০২.৪.২ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ক্রমবিকাশ

১০২.৫ কংগ্রেসের গঠন

১০২.৬ কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১০২.৬.১ কংগ্রেসের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

১০২.৭ কংগ্রেসে আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি

১০২.৮ রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সম্পর্ক

১০২.৯ সারাংশ

১০২.১০ প্রশ্নাবলী

১০২.১১ উত্তরমালা

১০২.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১০২.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের স্থান, ক্ষমতা ও ভূমিকা সম্বন্ধে আপনাকে অবহিত করা। এককটি পড়ে আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন —

- আমেরিকার রাষ্ট্রপতির যোগতা, কার্যকালের মেয়াদ ইত্যাদি;
- আমেরিকার রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি;
- আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী, সীমাবদ্ধতা এবং তাঁর ক্ষমতার ক্রমবিকাশ;

- মার্কিন কংগ্রেসের গঠন;
- মার্কিন কংগ্রেসের ক্ষমতা, কাজ ও সীমাবদ্ধতা;
- মার্কিন কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি;
- রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সম্পর্ক।

১০২.১ প্রস্তাবনা

১৭৮৯ এ রচিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী আমেরিকায় শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ও আইনবিভাগীয় ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং দুবারের বেশী নির্বাচিত হতে পারেন না। রাষ্ট্রপতিকে ইম্পীচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে পদচ্যুত করা যায়। রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হলে, বা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে বা তাঁর মৃত্যু হলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কাজ করেন। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। অঙ্গরাজ্যের জনগণ নির্বাচক সংস্থার সদস্যদের নির্বাচিত করেন এবং নির্বাচক সংস্থার সদস্যরা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন। দলপ্রথার উদ্ভবের ফলে এই নির্বাচন প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রপতির শাসন, আইন, অর্থ এবং জরুরী অবস্থাকালীন ক্ষমতা আছে। রাষ্ট্রপতির ভূমিকাকে আলোচনা করা যায় চারভাবে — দলনেতা, রাষ্ট্রপ্রধান, জনগণের প্রতিনিধি এবং বিশ্ব রাজনীতির নিয়ামক হিসাবে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অসীম হলেও রাষ্ট্রপতিকে একনায়ক বলা যায় না। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণগুলি হল কংগ্রেস, দলব্যবস্থা, জনমত, বিচারবিভাগ, আমলাতন্ত্র, শাসনতান্ত্রিক ও শাসনবহির্ভূত রীতিনীতি এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহ।

রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতার পাশাপাশি সংবিধান বহির্ভূতভাবেও কিছু ক্ষমতা দেখা যায়। বিচারের রায়, কংগ্রেসের সমর্থন দলব্যবস্থা, যুদ্ধ ও সংকটে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, জনমতের সমর্থন, সরকারী দায়দায়িত্বের প্রসার এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপতিদের দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার প্রসার ঘটিয়েছে।

কংগ্রেস জনপ্রতিনিধিসভা ও সেনেট নিয়ে গঠিত হয়। জনপ্রতিনিধিসভায় জনগণের প্রতিনিধি এবং সেনেটে রাজ্যের প্রতিনিধিরা থাকেন। কংগ্রেসের ক্ষমতা হল ঃ আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ, বিচার সংক্রান্ত কাজ, শাসনসংক্রান্ত কাজ, নির্দেশমূলক ও তত্ত্বধান, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, তদন্ত, যুদ্ধ এবং তথ্য সরবরাহ। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি দ্বারা কংগ্রেসের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানে কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার আলোচনা আছে।

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির ফলে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করে, কংগ্রেসও রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে উভয়ের সম্বন্ধে সহযোগিতা মূলক।

১০২.২ রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা, কার্যকালের মেয়াদ ইত্যাদি

মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্য রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর নিম্নলিখিত যোগ্যতার অধিকারী হতে হয় —

(i) অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাভাবিক নাগরিক হতে হবে।

(ii) অন্ততঃ ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।

(iii) অন্ততঃ ১৪ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে। এই বসবাসগত যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে হার্বার্ট হুভাবের রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সময় বিতর্ক ওঠে। হুভার একাদিক্রমে ১৪ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন নি। সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে একাদিক্রমে ১৪ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার প্রয়োজন নেই।

১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ কতদিন হওয়া উচিত সে নিয়ে মতানৈক্য ঘটে। অনেকে ৭ বছর মেয়াদের কথা বলেন এবং পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ ৪ বছর করা হয়। কিন্তু সংবিধানে তাঁর পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি। রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি হতে অস্বীকার করলে তখন থেকে এই শাসনতান্ত্রিক রীতি গড়ে ওঠে যে রাষ্ট্রপতি দুবাবের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না। জেনারেল গ্রান্ট ও থিওডোর রুজভেল্ট এই রীতিটিকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। গ্রান্ট রাষ্ট্রপতি হতে চাইলেও দল তাঁকে মনোনয়ন দেয়নি। রুজভেল্ট তৃতীয়বার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে পরাজিত হন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটকালে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ১৯৪০ সালে তৃতীয়বার এবং ১৯৪৪ সালে চতুর্থবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। তবে ১৯৫১ সালে সংবিধানের ২২ তম সংশোধন দ্বারা সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে। ঐ সংশোধন অনুসারে কোন রাষ্ট্রপতি তৃতীয়বারের জন্য ঐ পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারবেন না।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে তাঁর মৃত্যু হলে বা তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে বা তাঁকে পদচ্যুত করা হলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয়। তখন উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন। দেশদ্রোহিতা, উৎকোচগ্রহণ, দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী কাজের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যেতে পারে। ইম্‌পীচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে তাঁকে পদচ্যুত করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিসভায় অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং সেনেট সেই অভিযোগের বিচার করে। এই বিচারের সময় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। জনপ্রতিনিধিসভার অধিকাংশ সদস্য অভিযোগটি সমর্থন করার পর সেটি সেনেটে বিচারের জন্য যায়। সেনেটের উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ অভিযোগটি সমর্থন করলে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হন।

রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার পর উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু তখন যদি উপরাষ্ট্রপতির মৃত্যু

ঘটে, বা তিনি পদত্যাগ করেন বা পদচ্যুত হন তাহলে আবার রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয়। এই শূন্যপদ পূরণের ব্যাপারে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। এ ব্যাপারে ১৭৯২ সালে মার্কিন কংগ্রেস এই আইন রচনা করে এবং এই আইন অনুসারে তখন প্রতিনিধিসভার অধ্যক্ষ রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করবেন। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেস নতুন আইন করে। এই আইন অনুসারে উপরাষ্ট্রপতির পর সেক্রেটারী অফ স্টেট, তারপর প্রতিরক্ষা সচিব, তার পর অ্যাটর্ণী জেনারেল প্রভৃতি রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি কিছু সাংবিধানিক অব্যাহতি ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতির কার্যকালে তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা করা যাবে না, আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা যাবে না এবং কংগ্রেসের কোন কমিটির সামনে তাঁকে হাজির হতে বাধ্য করা যাবে না। ইম্‌পীচমেন্ট ছাড়া অন্যভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

১০২.৩ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কথা বলেন। অনেকে আবার কংগ্রেস দ্বারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের কথা বলেন। সংবিধান প্রণেতারা দুটি প্রস্তাবের কোনটিই গ্রহণ করেননি। প্রথম পদ্ধতিটি গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতিকে সব সময় জনগণের সন্তুষ্টিবিধানে ব্যস্ত থাকতে হবে আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কংগ্রেসের হাতের পুতুলে পরিণত হওয়ার এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত নির্বাচন সংস্থা দ্বারা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিশেষ পদ্ধতিটি সংবিধানে গৃহীত হয়।

সংবিধানের ২নং ধারায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতিটি আলোচিত হয়েছে। এই নির্বাচন পদ্ধতির দুটি পর্যায় আছে — প্রথম পর্যায় হল নির্বাচক সংস্থা গঠন এবং দ্বিতীয় পর্যায় হল নির্বাচক সংস্থার সদস্যদের দ্বারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন। প্রথম পর্যায় — প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের নাগরিকরা নির্বাচক সংস্থার সদস্যদের নির্বাচন করেন। কংগ্রেসের উভয় কক্ষে অঙ্গরাজ্যের যতজন প্রতিনিধি আছে সেই অঙ্গরাজ্যের নাগরিকরা ততজন সদস্যকে নির্বাচিত করেন। তবে কংগ্রেসের কোন সদস্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কর্মচারী নির্বাচক সংস্থার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতে পারে না। পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত সব সদস্যদের নিয়ে নির্বাচনী সংস্থা গঠিত হয়। নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পর প্রথম যে মঙ্গলবার আসে, সেই দিন নির্বাচক সংস্থার প্রতিনিধিদের নির্বাচন করার জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় — পরবর্তী ডিসেম্বর মাসের প্রথম বুধবারের পর প্রথম সোমবার প্রত্যেক অঙ্গ রাজ্যের নির্বাচক সদস্যরা নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যে মিলিত হয়ে গোপন ভোটদান পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ভোটদান করেন। সংবিধানের ২৩ তম সংশোধনের ফলে বর্তমানে নির্বাচক সদস্যরা নিজ নিজ জেলায় উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার

পর ভোটবাক্সগুলিকে সীল করে ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়। পরের বছর ৬ই জানুয়ারী সেনেটের অধ্যক্ষ সিনেট সদস্যদের সামনে ভোটপত্রগুলি গণনা করেন। যিনি নির্বাচক সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট লাভ করেন, তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদে যদি কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পান তাহলে অধিক ভোট পেয়েছেন এমন অনধিক তিনজন প্রার্থীর মধ্যে থেকে একজনকে জনপ্রতিনিধিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করে।

দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন কার্যত প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচক সংস্থার সদস্যরা দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন বলে তাঁরা নিজ নিজ দলের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষেই ভোট দেন। তাই নির্বাচন সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী রাষ্ট্রপতি কে হবেন তা স্থির করা যায়। নির্বাচক সংস্থা দ্বারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন তাই আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতিটি জটিল, সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। তাছাড়াও এই পদ্ধতিতে বড় কয়েকটি রাজ্যের ভোটদাতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন। ১৮টি অঙ্গরাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন। আর একজন ৩২টি অঙ্গরাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পরাজিত হতে পারেন। তাছাড়া দলব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে নির্বাচন আর পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অনেক সমালোচক জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা বলেন।

১০২.৪ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বিপুল সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ইংলণ্ডের রাজার মত রাজত্ব করেন, আবার ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর মত শাসন করেন। রাষ্ট্রপতি একাধারে নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসক। স্ট্রং-এর মতে, পৃথিবীর অন্য কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান দেখা যায় না। মার্কিন শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই হলেন কেন্দ্রীয় চরিত্র। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি হলেন একক শাসক, ইংল্যাণ্ডের মত ক্যাবিনেট তাঁর সঙ্গে ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভোগ করে না।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে নয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ঃ সংবিধানের ১(১) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির হাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতাকে আবার নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন —

(ক) জাতীয় প্রশাসনের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতি জাতীয় প্রশাসনের প্রধান

হিসেবে শাসনবিভাগীয় নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ, প্রশাসনিক আদেশ জারী, প্রশাসনিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ ও বিন্যাস, বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমন্বয়, প্রশাসনিক এজেন্সিগুলির তদারকি, বিভাগীয় কাজ সম্বন্ধে বিভাগীয় কর্মচারীদের কাছে লিখিত রিপোর্ট তলব, নির্দেশ অমান্যকারী বিভাগীয় কর্মচারীকে অপসারণ, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, বিদ্রোহদমন, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি ক্ষমতাগুলি ভোগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান, কংগ্রেস প্রণীত আইন, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের রায়, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ইত্যাদি ঠিকমত কার্যকর হচ্ছে কিনা তা রাষ্ট্রপতি দেখেন। প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনী মোতায়েন করে শান্তিশৃঙ্খলা বলবৎ করতে পারেন।

(খ) নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী কর্মচারীদের দুভাগে ভাগ করা হয়— উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ। বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান, কূটনৈতিক দূত, বিচারপতি, বাণিজ্যদূত, মন্ত্রী ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর আর ব্যুরো প্রধান ও অন্যান্য অধস্তন কর্মচারীরা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। প্রথম শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতিকে সেনেটের অনুমোদন নিতে হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রপতি যাদের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত করেন সেনেট তা সাধারণত মেনে নেয়। একে "সেনেটোরীয় সৌজন্যবিধি" বলে। এ জাতীয় নিয়োগের আগে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সেনেটরদ্বয়ের সঙ্গে আলোচনা করে নেন।

(গ) অপসারণের ক্ষমতা ঃ কর্মচারীদের অপসারণ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে সংবিধানে কিছু লেখা ছিল না। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে এ নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। শেষে স্থির হয়, রাষ্ট্রপতি সেনেটের মতামত ছাড়াই এককভাবে কর্মচারীদের পদচ্যুত করতে পারবেন। ১৮৬৬ সালে কংগ্রেস আইন করে ঘোষণা করে যে রাষ্ট্রপতি সেনেটের সম্মতি ছাড়া কর্মচারীদের অপসারণ করতে পারবেন না। তবে ১৮৮৭ সালে এই আইন বাতিল হয়ে যায়। তাই বর্তমানে নিয়ম হল যে যেসব কর্মচারীদের জন্য রাষ্ট্রপতিকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকতে হয় তাদের তিনি এককভাবে অপসারণ করতে পারবেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি, যে সব কমিশনের সদস্যদের আংশিক আইন ও আংশিক বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা আছে এবং রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়মাবলী অনুসারে নিযুক্ত কর্মচারীদের রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে পারবেন না।

(ঘ) সামরিক ক্ষমতা ঃ সংবিধান অনুসারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি সেনেটের অনুমোদনক্রমে সেনা ও নৌবাহিনীর অফিসারদের নিয়োগ করতে পারেন এবং যুদ্ধের সময় প্রয়োজনবোধে তাদের পদচ্যুত করতে পারেন। তত্ত্বগতভাবে কেবলমাত্র কংগ্রেস যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্রপতি এমনভাবে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেন যে কংগ্রেসের পক্ষে যুদ্ধঘোষণা ছাড়া উপায় থাকে না। আবার মার্কিন কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়া, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে সৈন্যপ্রেরণ করেছে। ১৯৭৪ সালে কংগ্রেস প্রণীত যুদ্ধক্ষমতা সম্পর্কিত আইন রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সৈন্য পাঠালে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তাঁকে কংগ্রেসকে জানাতে

হয়। কংগ্রেস অনুমোদন না করলে ৬০ দিনের মধ্যে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে হয়। তবে যুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে তাঁর একক ক্ষমতা আছে।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে রাষ্ট্রপতির সামরিক ক্ষমতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় তিনি 'নিয়মতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সৈন্য সংখ্যা স্থির করা, সৈন্য প্রেরণ করা, অস্ত্রশস্ত্রের কৌশল ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে অধিকৃত যে কোন অঞ্চলে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। বর্তমানে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটিস্থাপন, সামরিক জোটে অংশগ্রহণ ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রপতির সামরিক ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ঙ) বৈদেশিক ক্ষমতা ঃ সংবিধানে কোথাও রাষ্ট্রপতিকে বৈদেশিক নীতির একক নির্ধারক বলা হয় নি। কিন্তু কার্যতঃ তিনিই পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলেন পররাষ্ট্র বিষয়ে জাতির একমাত্র প্রতিভূ এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে জাতির একমাত্র প্রতিনিধি। রাষ্ট্রপতি অন্যান্য দেশের সঙ্গে সন্ধি ও কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন, আবার ওই সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিদেশী রাষ্ট্রে পাঠানোর জন্য রাষ্ট্রদূত, কন্সাল ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদের নিয়োগ করেন এবং অন্যদেশের রাষ্ট্রদূত, কন্সালদের গ্রহণ করেন। তাঁর রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ও সন্ধিচুক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সেনেটের দুই তৃতীয়াংশের অনুমোদন নিতে হয়। ১৯১৯ সালে রাষ্ট্রপতি উইলসন কতৃর্ক সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তি সিনেট বাতিল করে দেয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ অফ নেশনসে যোগ দিতে পারেনি।

রাষ্ট্রপতি সেনেটের অনুমোদনের ঝামেলা এড়ানোর জন্য কায়েকটি ব্যবস্থা নিতে পারেন, যেমন প্রসাশনিক চুক্তি সম্পাদন। এজন্য সেনেটের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। অথচ ওই রকম চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি, চুক্তি কার্যকর করতে পারেন, যেমন অতলান্তিক সনদ, কবলার প্রোটোকল, জাপসম্রাটের সঙ্গে রুজভেল্টের 'ভদ্রলোকের চুক্তি'।

১৯৩৪ সালে 'পারস্পরিক বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন পাশ করে কংগ্রেস তিন বছরের জন্য রাষ্ট্রপতিকে বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দেয়। পরে কয়েকবার এই সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়।

(২) আইন বিষয়ক ক্ষমতা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হওয়ায় তত্ত্বগতভাবে শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতির আইন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা নেই। তত্ত্বগতভাবে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হতে পারেন না, কংগ্রেসের কোন কক্ষকে ভেঙে দিতে পারেন না, কংগ্রেসের বিতর্কে যোগ দিতে, কংগ্রেসের বিল উত্থাপন করতে বা ভোট দিতে পারেন না। আইন সংক্রান্ত দিক থেকে তাঁর ভূমিকার পর্যালোচনা করতে গিয়ে ল্যাস্কি বলেছেন, "স্বাভাবিক অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঈর্ষা করতে বাধ্য।" কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে

অবস্থা অন্যরকম। রীতিনীতি উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রপতি আইনবিষয়ে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এইভাবে রাষ্ট্রপতি আইনসংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করেন।

(ক) বাণীপ্রেরণ ঃ সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কংগ্রেসকে ওয়াকিবহাল করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় কিছু ব্যবস্থার সুপারিশ করতে পারেন। এই সংবাদপ্রদান ও সুপারিশগুলিকে রাষ্ট্রপতির বাণী বলা হয়। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে প্রেরিত বাণীর মধ্যে দলীয় নীতির ঘোষণা, আইন প্রণয়নের সুপারিশ, সরকারী কাজের মূল্যায়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। ১৮২৩ সালে রাষ্ট্রপতি মনরো প্রেরিত বাণীর মধ্যে 'মনরো ডকট্রিন', ১৯৪১ সালে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টর বাণীর মধ্যে তার পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতি স্থানলাভ করে।

রাষ্ট্রপতি প্রেরিত বাণী বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলি দ্বারা জনগণের নজরে আসে এবং তা জনমতকে প্রভাবিত করে। জনসমর্থন হারানোর ভয়ে কংগ্রেস সাধারণত রাষ্ট্রপতির বাণী উপেক্ষা করতে পারে না। তবে রাষ্ট্রপতির বানী কংগ্রেসকে কতটা প্রভাবিত করবে তা নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার ওপর। রাষ্ট্রপতি লিখিত ও মৌখিক দুধরনের বাণী প্রেরণ করতে পারেন।

(খ) জরুরী অধিবেশন আহ্বান ও অধিবেশন মুলতুবী রাখা ঃ রাষ্ট্রপতি সাধারণত কগ্রেসের অধিবেশন আহবান করতে পারেন না। তবে জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশেষ অধিবেশণন আহ্বান করতে পারেন। তিনি তাঁর সুপারিশ গ্রহণে কংগ্রেসকে বাধ্য করতে পারেন না। তবে কংগ্রেস তাঁর দলের গরিষ্ঠতা থাকলে বা জনমত তাঁর পক্ষে থাকলে তিনি কংগ্রেসকে নিজ অনুকূলে প্রভাবিত করতে পারেন। অধিবেশন মুলতুবী রাখার ব্যাপারে দুকক্ষের মধ্যে মতবিরোধ হলে রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(গ) অর্ডিনান্স ও শাসনবিভাগীয় আদেশ জারী ঃ বর্তমানে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনের সংখ্যা ও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস সব আইন বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করতে পারে না। আইনের মূল কাঠামো ও নীতিগুলি কংগ্রেস রচনা করে। আইনকে পরিপূর্ণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়। আইনের ফাঁকগুলি পূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স ও শাসনবিভাগীয় আদেশ জারী করতে পারেন। এগুলি আইনের মতই কার্যকরী।

(ঘ) 'ভিটো' প্রয়োগ ঃ কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত সংবিধান সংশোধনী বিল ছাড়া প্রতিটি বিলেই রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। রাষ্ট্রপতি বিলটি সম্পর্কে তিন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন— (i) তিনি বিলে স্বাক্ষর প্রদান করতে পারেন। ফলে বিলটি আইনে রূপান্তরিত হয়। (ii) তিনি কোন বিলে সম্মতি জানাতে অস্বীকার করতে পারেন। বিলে অসম্মতি জ্ঞাপনকে 'ভিটো' বলে। এক্ষেত্রে দশদিনের মধ্যে বিলটি যে কক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিল সেই কক্ষে ভিটোসহ ফেরৎ পাঠাতে হয়। তবে সংশ্লিষ্ট বিলটি কংগ্রেসের উভয় কক্ষে পুনরায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হলে

বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়াই আইন পরিণত হয়। (iii) রাষ্ট্রপতি বিলে স্বাক্ষর না করে বিলটি আটকে রাখতে পারেন। বিল প্রেরণের ১০ দিনের মধ্যে যদি কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সেই বিলটির মৃত্যু ঘটে। এই ব্যবস্থাকে পকেট ভিটো (Pocket Veto) বলে। ভিটো প্রয়োগ করে বা ভিটোর ভয় দিয়ে রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজকে প্রভাবিত করতে পারেন।

(ঙ) চাকুরী বিতরণ ঃ চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বিতরণের দ্বারা তিনি কংগ্রেসের অনেক সদস্যকে নিজ প্রভাবাধীন করতে পারেন। তাদের দিয়ে তিনি তাঁর পছন্দমত বিল কংগ্রেসে উত্থাপন করাতে পারেন।

(চ) দলব্যবস্থার উদ্ভব ঃ রাষ্ট্রপতি তাঁর দলের নেতা। দলীয় নেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের দলীয় সদস্যদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া কংগ্রেসে উপস্থাপিত করতে পারেন। কংগ্রেসে তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে এই ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়।

(৩) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতির অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি হল ঃ

(i) ১৯২১ সালের প্রণীত 'বাজেট ও হিসাবরক্ষা আইন' অনুসারে রাষ্ট্রপতি ব্যয়নির্বাহের জন্য কংগ্রেসের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ দাবি করতে পারেন। এই আইন অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন বিভাগের আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে, হ্রাস করতে বা সংশোধন করতে পারেন।

(ii) তাঁকে সারা বছরের জন্য আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব কংগ্রেসের সামনে পেশ করতে হয়।

(iii) রাষ্ট্রপতি ব্যয়বরাদ্দের পরিপূরক দাবিও কংগ্রেসের কাছে উত্থাপন করতে পারেন। তবে কংগ্রেসকে দাবি অনুযায়ী বরাদ্দ মঞ্জুর করবে এমন কথা নেই। তবে রাষ্ট্রপতির দলভুক্ত সদস্যরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতির ব্যয়বরাদ্দ সহজেই কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করে।

(iv) 'বাজেট ও হিসাবরক্ষা আইন' অনুসারে 'বাজেট ব্যুরো' গঠিত হয়। এর কাজ রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করা। ব্যুরোর ডাইরেকটর রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন এবং তাঁর অধীনে থেকে তাঁর নির্দেশেই কাজ করেন।

(৪) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতির বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি হল —

(i) রাষ্ট্রপতি সেনেটের অনুমোদন ক্রমে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। তবে তাঁদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

(ii) সংবিধানের ২ (২) নং ধারা রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার প্রদান করেছে। ইম্‌পীচমেন্ট ছাড়া অন্য যে কোন অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীদের দণ্ডাদেশ রাষ্ট্রপতি স্থগিত রাখতে পারেন, হ্রাস করতে পারেন বা শাস্তির হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের আইনভঙ্গের জন্য শাস্তিপ্রাপ্তদের রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার আছে। অঙ্গরাজ্যের আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত

ব্যক্তিদের তিনি ক্ষমাপ্রদর্শন করতে পারেন না। দণ্ড হওয়ার আগে, পরে বা কারাবাসকালীন সময়েও রাষ্ট্রপতি দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শন করলে তা বাধ্যতামূলক ভাবে কার্যকর হয়।

(৫) জরুরী অবস্থাকালীন ক্ষমতা ঃ গৃহযুদ্ধ, অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ বা অর্থনৈতিক সংকটে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্থল বিমান ও নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে, রাষ্ট্রপতি সৈন্য পরিচালনা, যুদ্ধপ্রণালী ও রণকৌশল স্থির করেন, এবং জাতীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করতে পারেন। কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি যুদ্ধের সময় অধিকৃত অঞ্চলে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উইলসন্ এবং অর্থনৈতিক মন্দার সময় রুজভেল্টের হাতে কংগ্রেস বিপুল পরিমাণ ক্ষমতা প্রদান করে।

(৬) **দলীয় নেতা হিসাবে ভূমিকা ঃ** দলনেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতির দল জনগণের সামনে যে কর্মসূচী ঘোষণা করেন নির্বাচনে জয়লাভ করার পর সেই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা তাঁর দায়িত্ব। দল ও দলের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সিনেট ও প্রতিনিধিসভায় তাঁর দলের প্রাধান্য থাকলে কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় না। নিজ দলের জাতীয় সংগঠন পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ভূমিকাই প্রধান। জাতীয় দলের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৭) রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ভূমিকা ঃ ইংলন্ডের রাজা বা রাণীর মত মার্কিন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিশিষ্ট অভ্যাগতদের অভিবাদন জানান, জাতির পক্ষে বড়দিন বা 'ক্রিসমাস' উৎসবের আলোকবৃক্ষ প্রজ্জ্বলিত করেন।

(৮) জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ভূমিকা ঃ রাষ্ট্রপতি জনগণের নেতা হিসাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেন। তিনি হলেন জনগণের নৈতিক মুখপাত্র ও জনমানসের প্রতিনিধি। নেতা হিসাবে জনগণের আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত করেন রাষ্ট্রপতি। জনসমর্থনের ওপরই তাঁর ভাগ্য নির্ভর করে।

(৯) বিশ্ব রাজনীতিতে ভূমিকা ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতি থেকে দূরে থাকত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা অন্যতম বৃহৎ শক্তি হিসাবে দেখা দেয় এবং বিশ্বরাজনীতিকে প্রভাবিত করার জন্য সচেষ্ট হতে থাকে। বিশ্বে মার্কিন আধিপত্য স্থাপন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে মার্কিন স্বার্থে ব্যবহার, সমাজতন্ত্রের প্রসাররোধ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি সক্রিয় থাকেন। এজন্য তিনি একদিকে শক্তিজোট গঠন করেন এবং অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন।

রাষ্ট্রপতির প্রভূত ক্ষমতা থাকলেও তাঁর প্রভাব নির্ভর করে দুটি বিষয়ের ওপর —

(i) সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল হলে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, নতুবা নয়।

(ii) রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের ওপর তাঁর ক্ষমতা নির্ভরশীল। ওয়াশিংটন, লিঙ্কন, রুজভেল্ট, উইলসন, কেনেডি ইত্যাদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপতিদের ভূমিকা রাষ্ট্রপতির পদকে মর্যাদা প্রদান করেছে।

১০২.৪.১ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতা থাকলেও সেই ক্ষমতা অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। তিনি একনায়কের মত অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী নন। তাঁর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি ফলে সরকারের তিনটি বিভাগের কোনটিই অবাধ ক্ষমতার অধিকারী নয়। শাসনতান্ত্রিক ও শাসনবহির্ভূত বিভিন্ন বাধানিষেধ, কংগ্রেসের দ্বারা আরোপিত বাধা, দলব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, জনমতের চাপ, বিচারবিভাগের রায়, আমলাতান্ত্রিক বাধা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা ইত্যাদি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে।

১০২.৪.২ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ক্রমবিকাশ

সংবিধান স্বীকৃত ক্ষমতার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি সংবিধান বহির্ভূতভাবে কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন। সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্রপতির হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দান করে তাঁর ওপর কিছু বাধানিষেধ আরোপ করেন। তাঁরা রাষ্ট্রপতির সীমাবদ্ধ রূপের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবৃদ্ধি মার্কিন শাসনতন্ত্রের বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই শাসনবিভাগের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। অর্থনৈতিক সংকট, যুদ্ধবিগ্রহ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ইত্যাদি নানা কারণে সব রাষ্ট্রেই শাসনবিভাগের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়েছে। এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেন্টারী বা রাষ্ট্রপতি শাসিত সব ব্যবস্থাতেই এই প্রবণতা দেখা যায়। ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মত মার্কিন শাসনও এই প্রবণতামুক্ত নয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য হল —

(১) বিচার বিভাগের রায় ঃ সুপ্রীম কোর্ট রায় দানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রদান করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বনাম কারটিস-রাইস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন, ১৯৬৬ মামলায় পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির অপ্রতিহত ক্ষমতা স্বীকৃত হয়েছে। মেয়ার্স বনাম যুক্তরাষ্ট্র, ১৯২৬ মামলায় রাষ্ট্রপতির অপসারণ সংক্রান্ত ক্ষমতাকে প্রায় নিরঙ্কুশ করা হয়।

(২) কংগ্রেসের ভূমিকা ঃ কংগ্রেস অর্থনৈতিক সংকট ও যুদ্ধকালীন অবস্থায় হস্তান্তরিত ক্ষমতার নিয়মনীতি অনুসারে অনেক বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছে। আমদানী-রপ্তানী শুল্ক নির্ধারণ, বাজেট তৈরী ও তা কংগ্রেসে পেশ করার ক্ষমতা ও রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের কাছ থেকে পেয়েছেন। জাতীয় নেতা হিসাবে মর্যাদা, দলীয় নেতৃত্ব ইত্যাদির কারণে রাষ্ট্রপতিরা কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছেন।

(৩) দলব্যবস্থা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বেড়েছে। রাষ্ট্রপতি দলীয় নেতা। তাঁর দলীয় সদস্যদের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দল কংগ্রেসের উভয় কক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলে এই নিয়ন্ত্রণ আরও সুদৃঢ় হয়।

(৪) যুদ্ধ ও সংকট ঃ যুদ্ধ ও যুদ্ধের আশংকা মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। দেশের নিরাপত্তা ও সংকটে রাষ্ট্রপতির বাড়তি ক্ষমতার দাবি কংগ্রেস মেনে নিয়েছে।

(৫) জনমতের সমর্থন ঃ মার্কিন জনগণ রাষ্ট্রপতির মতকে জাতীয় মত বলে মনে করে। তাঁর নেতৃত্বের ওপর দেশবাসীর অগাধ আস্থা। এই আস্থার ফলে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেন, জনগণ তা সমর্থন করে। আমেরিকার ওপর ইসলামি জঙ্গীদের আক্রমণের (১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১) পর মার্কিন জনগণ পুরোপুরি রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন।

(৬) সরকারী দায় দায়িত্বের প্রসার ঃ দেশের মধ্যে ও বাইরে সরকারের দায় দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে দেশের মধ্যে সরকারী জনকল্যাণমূলক কাজ বেড়েছে, অন্যদিকে অকমিউনিষ্ট জগতের নেতা ও এক নম্বর বিশ্বশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রসাশনিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও বেড়েছে।

(৭) রাষ্ট্রপতি পদের ভূমিকা ঃ দৃঢ়চেতা রাষ্ট্রপতিদের ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভূমিকা রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। গৃহযুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা, আর্থিক সংকটে রুজভেল্টের 'নিউ ডিল', কিউবার সঙ্কটে জন কেনেডির সিদ্ধান্ত ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১০২.৫ কংগ্রেসের গঠন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কংগ্রেস। ভারত, সুইজারল্যাণ্ড, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের আইনসভার মত মার্কিন কংগ্রেসও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ বা সিনেটে অঙ্গরাজ্যের সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকে, আর নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধিসভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। অর্থাৎ উচ্চকক্ষে থাকে রাজ্যগুলির প্রতিনিধি আর নিম্নকক্ষে থাকে জনগণের প্রতিনিধি।

জনপ্রতিনিধিসভা (House of Representatives)

গঠন — এই কক্ষের আকার সম্বন্ধে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। কেবলমাত্র জাতীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতেই জনপ্রতিনিধিসভার সদস্যরা দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন বলে সংবিধানে লেখা আছে। সাধারণতঃ, ৪,৮০,০০০ জনসংখ্যা পিছু একজন করে প্রতিনিধি এই কক্ষে নির্বাচিত হন। ভোটাধিকারের ভিত্তি স্থির করে অঙ্গরাজ্যগুলি। কোথাও কর প্রদানকে, কোথাও শিক্ষাগত যোগ্যতাকে মাপকাঠি করা হত। ২৪তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে, করপ্রদানে অক্ষমতার অজুহাতে এবং পঞ্চদশ ও উনবিংশ সংবিধান অনুসারে জাতি, নারীত্ব, বর্ণ ও পূর্ব দাসত্বের অভিযোগে কোন নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা

যাবে না। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন ১৮ বছর বয়স্ক যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক নাগরিক জনপ্রতিনিধিসভার সদস্যদের নির্বাচন করতে পারে।

জনপ্রতিনিধিসভায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা হল — (১) কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক; (২) অন্ততঃ ৭ বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব; (৩) প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা; (৪) সরকারী পদে অধিষ্ঠিত না থাকা।

অধিবেশন চলাকালীন অবস্থায় দেওয়ানী অপরাধের জন্য তাঁদের গ্রেপ্তার করা যায়। কিন্তু সভার আলোচনার সময় সদস্যরা যে বক্তব্য রাখেন, সেজন্য তাদের কোন শাস্তি দেওয়া যায় না।

জনপ্রতিনিধিসভার অধিবেশন বছরে অন্ততঃ একবার আহ্বান করতে হয়। ৩রা জানুয়ারী সভার অধিবেশন আহুত হয় ও ৩১শে জুলাই পর্যন্ত তা চলে। একই সঙ্গে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতি যে কোন সময় বিশেষ প্রয়োজনে জনপ্রতিনিধিসভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। জনপ্রতিনিধিসভার সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে স্পীকার নির্বাচন করেন। তিনি সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কয়েকটি কমিটির মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিসভার কার্যাবলী সম্পাদিত হয়।

সেনেট (Senate) --- অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সেনেট গঠিত হয়। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে দুই জন করে প্রতিনিধিকে সেনেটের সদস্য নির্বাচিত করা হয়। মোট ৫০টি অঙ্গরাজ্য থেকে ১০০ জন প্রতিনিধি সেনেট সভায় থাকেন। সমপ্রতিনিধিত্ব দ্বারা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব অঙ্গরাজ্যকে সমানভাবে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সংবিধান অনুসারে, কোনও অঙ্গরাজ্যের সম্মতি ছাড়া সেই রাজ্যকে সেনেটের সমপ্রতিনিধিত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

সেনেট সদস্য হতে গেলে প্রার্থীর যোগ্যতা হল ঃ— (১) অন্ততঃ ৩০ বছর বয়স্ক; (২) কমপক্ষে ৯ বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং (৩) প্রতিন্দ্বীতাকারী অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা।

প্রথমে অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভা সেনেট সদস্যদের নির্বাচিত করত। পরে সেনেট নির্বাচনে দলীয়, প্রাধান্য ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সেনেট সদস্যদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের দাবী ওঠে। ১৯১৩ সালে সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনের মাধ্যমে স্থির হয়, যে সেনেট সদস্যরা ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন।

সেনেট ঃ স্থায়ী পরিষদ — সেনেটের প্রতিটি সদস্যের কার্যকাল ৬ বছর। প্রতি দুবছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর নেন এবং এক তৃতীয়াংশ নির্বাচিত হয়। কোন সময় শূন্য না হয়, তা দেখা হয়। সেনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন উপরাষ্ট্রপতি। তিনি ভোটপ্রদান করেন। পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে তিনি নির্ণায়ক ভোট দেন। প্রতি বছর ৩রা জানুয়ারী সেনেটের অধিবেশন শুরু হয়। সেনেটও কয়েকটি কমিটির সাহায্যে কাজ করে।

১০২.৬ কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

আমেরিকার সংবিধান প্রণেতারা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ও কংগ্রেস আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হল :—

(১) **আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা :** কংগ্রেসের প্রধান কাজ আইনপ্রণয়ন। কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। কোন বিল নিয়ে উভয় পক্ষের মত পার্থক্য হলে উভয় কক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কনফারেন্স কমিটি তার মীমাংসা করে।

কংগ্রেসের আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা দুধরনের — (ক) সাংবিধানিক — আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতা। (খ) অন্যান্য—শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, বিচারের রায়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা আবার তিন ধরনের — (অ) অনুমিত ক্ষমতা — জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় আইনপ্রণয়ন; (আ) জরুরী ক্ষমতা—জরুরী অবস্থায় কাজ করার ক্ষমতা এবং (ই) অন্তর্নিহিত ক্ষমতা—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষমতা।

(২) **সংবিধান সংশোধন :** সংবিধান অনুসারে কংগ্রেস উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বা দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভাসমূহের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহুত কনভেনশনে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করা যায়। অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভাসমূহের তিন চতুর্থাংশ দ্বারা বা ঐ উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ্যগুলিতে আহুত কনভেনশনের তিনচতুর্থাংশ দ্বারা অনুমোদিত হলে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস এককভাবে সংবিধান সংশোধন করতে না পারলেও তার সম্মতি ছাড়া সংবিধানের কোন অংশেরই সংশোধন সম্ভব নয়।

(৩) **নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতি পদে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারলে জনপ্রতিনিধি সভা সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত তিনজনের মধ্যে থেকে একজনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে। একইভাবে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দুজনের মধ্য থেকে সেনেট উপরাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত করে। ১৮০১ ও ১৮২৫ সালে জনপ্রতিনিধিসভা এবং ১৮৭৬ সালে সেনেট এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

(৪) **বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ইম্পীচমেন্ট অভিযোগ এনে বিচার করতে পারে। জনপ্রতিনিধি সভা অভিযোগ আনে ও সেনেট তা বিচার করে। সেনেট দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রস্তাব গ্রহণ করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পদত্যাগ করতে হয়।

কংগ্রেসের কোন কক্ষের সদস্য না এরূপ কোন ব্যক্তি কংগ্রেসের কাজে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করলে বা বাধা দিলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ তাকে শাস্তি দিতে পারে। সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করলে সংশ্লিষ্ট কক্ষে কংগ্রেসের অবমাননার দায়ে সেই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। মনে করলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখার জন্য সার্জেন্ট-অ্যাট-আর্মসকে নির্দেশ দেয়। যতদিন কংগ্রেসের

অধিবেশন চলে ততদিনের জন্যই ব্যক্তিটিকে আটকে রাখা যায়।

(৫) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতিকে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেনেটর দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ছাড়া এই ক্ষমতা কার্যকর হয় না। সেনেটে অন্য দলের সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে রাষ্ট্রপতির সন্ধিচুক্তি বা নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব যে কোন মুহূর্তে বাতিল হয়ে যেতে পারে।

(৬) নির্দেশমূলক ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা ঃ কংগ্রেস প্রশাসনিক দপ্তর ও এজেন্সিগুলিকে গঠন করে। তাদের গঠনক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা নেই। কংগ্রেস আইনপ্রণয়ন করে তা স্থির করে। তাছাড়া এগুলির জন্য ব্যয় কংগ্রেসই অনুমোদন করে। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া কোন খরচ করা যায় না কংগ্রেস যে কোন সময় আইন প্রণয়ন করে প্রশাসনিক দপ্তরগুলিকে তাদের কার্যাবলীর রিপোর্ট কংগ্রেসের সামনে পেশ করার নির্দেশ দিতে পারে।

(৭) প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ ঃ কংগ্রেসের সদস্যরা নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধি। তাদের স্বার্থ দেখা কংগ্রেসের কাজ। তাদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে।

(৮) বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ঃ সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন মামলার রায়ে ঘোষণা করেছে যে আন্তঃরাজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে।

(৯) তদন্ত করার ক্ষমতা ঃ সেনেট শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। তদন্ত কমিটি গঠন করে সেনেট যে কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করে।

(১০) যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজ ঃ যুদ্ধ ঘোষণা, সামরিক বাহিনীগঠন, অভ্যুত্থান দমন ইত্যাদির দায়িত্ব কংগ্রেসের হাতে। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রপতি যুদ্ধঘোষণা বা সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে পারে না।

(১১) তথ্য সরবরাহ ঃ সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে কংগ্রেসে আলোচনা ও বিতর্কের সময় যে সব তথ্য ও সংবাদ পরিবেশিত হয়, তার দ্বারা জনগণ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে।

১০২.৬.১ কংগ্রেসের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো মার্কিন কংগ্রেস সার্বভৌম আইনসভা নয়। কংগ্রেসের ওপর নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ আছে —

(১) নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির জন্য এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শাসনবিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতি নানাভাবে কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন — (ক) বাণীপ্রেরণ দ্বারা

রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করেন।

(খ) রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন এবং অধিবেশন মুলতুবী রাখার ব্যাপারে উভয় কক্ষের মতবিরোধ হলে সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

(গ) কংগ্রেস আইনের মূল কাঠামো স্থির করে। আইনের ফাঁক পূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন-বভাগীয় আদেশ জারী করতে পারেন। এগুলি আইনের মতই কার্যকরী।

(ঘ) রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হয় না।

(২) সংবিধান কংগ্রেসের ওপর কিছু বাধানিষেধ আরোপ করে, যেমন — কংগ্রেস এককভাবে সংবিধান করতে পারে না, কোন অঙ্গরাজ্যের সম্মতি ছাড়া তার সীমানা বা সেনেটে তার প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা বদলাতে পারে না, নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

(৩) কংগ্রেস জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা ভোগ করে না। তবে মন্দা বা যুদ্ধের মোকাবিলার জন্য কংগ্রেস জরুরী আইন প্রণয়ন করতে পারে।

(৪) সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস প্রণীত যে কোন আইনের যাথার্থ্য বিচার করে। সংবিধান বা ন্যায়নীতি বিরোধী যে কোন আইনকে বাতিল করে দিতে পারে।

(৫) স্বার্থগোষ্ঠীগুলি কংগ্রেসকে প্রবাবিত করে নিজেদের অনুকূলে আনে। নানা কারণে স্বার্থগোষ্ঠীর চাপের কাছে কংগ্রেস নতিস্বীকার করে।

(৬) অন্যান্য দেশের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আইনসভার থেকে শাসনবিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির গুরুত্ব বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে প্রসারিত হয়েছে। ফলে কংগ্রেসের ক্ষমতার হ্রাস ঘটেছে।

১০২.৭ কংগ্রেসে আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিল দুরকমের---

(ক) প্রাইভেট ঃ যেসব বিলের সঙ্গে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির স্বার্থ জড়িত।

(খ) পাবলিক ঃ যেসব বিলের সঙ্গে সরকারী নীতি বা বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত।

অর্থবিল ছাড়া অন্য যে কোন বিল কংগ্রেসের যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। অর্থবিল কেবলমাত্র জনপ্রতিনিধিসভায় উত্থাপিত হয়। উত্থাপক নিজের স্বাক্ষরযুক্ত বিলের একটি কপি জনপ্রতিনিধিসভার ক্ষেত্রে করণিকের এবং সেনেটের ক্ষেত্রে সচিবের টেবিলের ওপর অবস্থিত বাক্সে ফেলে দেন। সচিব বা করণিক বিলটিতে ক্রমিক সংখ্যা বসিয়ে সেটি সরকারী মুদ্রণ অফিসে পাঠান। পরদিন সদস্যদের মুদ্রিত কপি দেওয়া হয়। এটি হল বিলের প্রথম পর্যায়।

বিলটিকে তারপর শিরোনাম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে পাঠাতে হয়।

কমিটি বিলটির গুরুত্ব বিচার-বিবেচনা করে। কমিটি যে বিলগুলিকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সেগুলি ফাইলবন্দী করে রাখে। গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি বিচার-বিবেচনা করে। এজন্য কমিটি বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। কমিটির চেয়ারম্যান বা তাঁর মনোনীত কোন সদস্য বিল সম্পর্কে কক্ষের কাছে রিপোর্ট পেশ করে।

কমিটির রিপোর্টসহ বিলটি ফেরৎ আসার পর সভার ক্লার্ক বিলটিকে তালিকাভুক্ত করেন। তালিকাকে ক্যালেণ্ডার বলে।

জনপ্রতিনিধিসভায় বিলটির ওপর ভোটদান করা হয়। ভোটগ্রহণের পর সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

জনপ্রতিনিধিসভায় গৃহীত হওয়ার পর বিলটি সেনেটে যায়। সেনেটে বিলটি জনপ্রতিনিধিসভার মত একই পদ্ধতিতে গৃহীত হয়।

জনপ্রতিনিধিসভা কর্তৃক প্রেরিত বিলে সেনেট সম্মতি দিলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য বিলটি পাঠান হয়। রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি জানালে সেটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি ভিটো বা জয়েন্ট ভিটো দিলে বিলটি নাকচ হয়ে যায়।

১০২.৮ রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সম্পর্ক

মার্কিন শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির জন্য প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি, আইনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে কংগ্রেস এবং বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট পৃথকভাবে কাজ করে। ইংল্যাণ্ডের সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্টের মধ্যে যে গভীর যোগ আছে, মার্কিন শাসনব্যবস্থায় তা নেই। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের সদস্য নন। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান বা স্থগিত রাখতে বা নিম্নকক্ষকে ভেঙে দিতে পারেন না। আবার খুশিমত আইনসভায় উপস্থিত হয়ে বিতর্ক বা আলোচনায় যোগদানের অধিকার তাঁর নেই। মার্কিন কংগ্রেসের কাছে রাষ্ট্রপতি দায়িত্বশীলও নন। কংগ্রেস অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে পারে না। আইন ও শাসনবিভাগ পৃথকভাবে নিজ বিভাগীয় দায়িত্ব সম্পাদন করেন। কিন্তু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিও গৃহীত হয়েছে। তাই রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই বা একে অপরের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণমুক্ত, একথা ঠিক নয়।

বাস্তবে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি যে সকল পদ্ধতির সাহায্যে কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন সেগুলি দুরকম —

(১) আনুষ্ঠানিক—সংবিধান স্বীকৃত পদ্ধতি হল আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি, তেমন কংগ্রেসে বানী প্রেরণ,

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান, ভেটো প্রদান ইত্যাদি।

(২) অ-আনুষ্ঠানিক—সংবিধান বহির্ভূত পদ্ধতি, যেমন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, নিজস্ব লবি গঠন, জনমত গঠন ইত্যাদি।

পদ্ধতিগুলি নিম্নে আলোচিত হল ঃ-

আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি —

(ক) বাণীপ্রেরণ---রাষ্ট্রপতির আইনপ্রণয়নের প্রত্যক্ষভাবে কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। সংবিধানের ২-সংখ্যক ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের কাছে দেশের অবস্থা সম্পর্কে বাণী পাঠাতে পারেন। এই বাণীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় আইনের সুপারিশ করেন। কংগ্রেস আইনপ্রণয়নের সময় এই সুপারিশগুলি অগ্রাহ্য করতে পারে না। রাষ্ট্রপতির বাণী নিয়ে কংগ্রেসের বিতর্ক সংবাদপত্র, দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে দেশবাসী জানতে পারে। রাষ্ট্রপতি দেশবাসীর স্বার্থের প্রতীক। রাষ্ট্রপতির বাণী কংগ্রেস অগ্রাহ্য করলে জনমতের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয় থাকে। তাই কংগ্রেস সাধারণতঃ রাষ্ট্রপতির বাণী প্রত্যাখান করে না।

(খ) কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান—রাষ্ট্রপতি আইনসভার অধিবেশন আহ্বান স্থগিত করতে পারে না। কিন্তু যে কোন কক্ষের বা উভয় কক্ষের বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যে বিষয়ে এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন, কংগ্রেসকে সে বিষয়ে আলোচনা করতে হয়। অধিবেশন স্থগিত করার ব্যাপারে দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ হলে রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনা মত অধিবেশন স্থগিত করেন।

(গ) রাষ্ট্রপতির "ভেটো" ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। কংগ্রেস দ্বারা গৃহীত যে কোন বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালে রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষর দিতে পারে, স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করতে পারেন বা স্বাক্ষর দান স্থগিত রাখতে পারেন। স্বাক্ষর দিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করাকে " ভেটো" প্রয়োগ বলে। ভেটো প্রয়োগ করলে বিলটি আইনে পরিণত হয় না। কিন্তু ১০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে বিলটি কংগ্রেসে ফেরৎ পাঠাতে হয়। কংগ্রেসের প্রত্যেক কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে বিলটি পুনরায় অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়াই তা আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত বিল দশ দিনের মধ্যে স্বাক্ষরিত না হলে এবং ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে বিলটির মৃত্যু হয়। এইভাবে ভেটো দান স্থগিত রাখাকে পকেট ভেটো বলে। ভেটো দেওয়ার ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসকে রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আগে থেকেই রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রযুক্ত হবে জানতে পারলে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির পছন্দ অনুসারে বিলটির পুনর্বিন্যাস করে থাকে। এই ভেটো ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় কক্ষে পরিণত করেছে।

অ-আনুষ্ঠানিক —

(১) **দলব্যবস্থার উদ্ভব**— রাষ্ট্রপতি দলীয় নেতা। কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই রাষ্ট্রপতির দলের সদস্য

থাকে। রাষ্ট্রপতি দলীয় সদস্যদের মাধ্যমে তাঁর ঘোষিত নীতি ও সিদ্ধান্তকে কার্যকর করেন। কংগ্রেসের দুটি কক্ষে তাঁর দলের সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন মতো আইন প্রণয়ন করতে কোন অসুবিধা হয় না।

(২) **পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন** — রাষ্ট্রপতি চাকরী ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বিতরণের মাধ্যমে কংগ্রেসের সদস্য নিজ পক্ষে নিয়ে আসতে পারেন। বিশেষ করে প্রভাবশালী সদস্যদের তিনি এইভাবে প্রভাবিত করতে পারেন।

(৩) **ব্যক্তিগত যোগাযোগ** — রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য ও কমিটি সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রেখে চলেন। কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই ধরনের আলোচনার ফলে কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক সহজ হয় এবং রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। তবে রাষ্ট্রপতি নিজের দল ও বিরোধী দল---সব সদস্যদের সঙ্গেই আলোচনা করে থাকেন।

(৪) **জনমত গঠন** — বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির আইনের প্রস্তাব জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। এইভাবে রাষ্ট্রপতি জনমতকে প্রভাবিত করে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করতে পারেন। কংগ্রেস জনসমর্থন হারানোর ভয়ে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাকে মানতে বাধ্য হয়।

(৫) **রাষ্ট্রপতির লবি** — যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের কর্মচারীরা হলেন রাষ্ট্রপতির 'লবি'। তাঁরা রাষ্ট্রপতির অধীনে কাজ করেন। রাষ্ট্রপতির কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই লবি সাহায্য করে। এই লবির সাহায্যে তিনি কংগ্রেসকে প্রভাবিত করেন।

(৬) **ব্যক্তিগত আবেদন** — অনেক সময় রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করে কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রপতির আবেদনকে কংগ্রেস সহজে প্রত্যাখ্যান করে না।

(৭) **আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব** — বর্তমানে আইনপ্রণয়নের কাজটি জটিল ও বিশেষজ্ঞের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমলাতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায়। তাই কংগ্রেসের সদস্যরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অনেক সময় কংগ্রেস আইনের খুঁটিনাটি বিষয় প্রণয়নের দায়িত্ব শাসনবিভাগকে সমর্থন করে। এইভাবে সংবিধান বহির্ভূত পথে কংগ্রেসের আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের হাতে আসে। আমলাতন্ত্রের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি আইনসংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপের সুযোগ পান।

(৮) **রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব** — রাষ্ট্রপতি জাতির নেতা। কংগ্রেসের নেতৃত্ব বহুজনের হাতে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি দ্রুত কাজ করতে পারেন। বহুজনের হাতে নেতৃত্ব থাকায় কংগ্রেস দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ফলে যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইত্যাদি সময়ে মার্কিন জনগণ কংগ্রেসের বদলে রাষ্ট্রপতির ওপর বেশি নির্ভর করে। ফলে রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন ক্ষমতা (আইন প্রণয়ন ক্ষমতাসহ) বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা এতক্ষণ রাষ্ট্রপতি কিভাবে কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন তা আলোচনা করা

হলো। কংগ্রেসও রাষ্ট্রপতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। রাষ্ট্রপতি যাতে স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত না হন তার ব্যবস্থাও আছে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির মধ্যে। কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে নিম্নলিখিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে —

(১) **ব্যয়বরাদ্দের দাবি** — রাষ্ট্রপতি বাজেট তৈরী করেন। কিন্তু কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া তা কার্যকর হয় না। কংগ্রেস ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করে। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের কাছে যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি করেন, কংগ্রেস তা মেনে নাও নিতে পারে। অনেক সময়ই কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির ব্যয়বরাদ্দের দাবি কমিয়ে দেয়।

(২) **সন্ধিচুক্তি ও নিয়োগ** — রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের বিনা সম্মতিতে কোন সন্দিচুক্তি বা নিয়োগ কার্যকর করতে পারেন না।

(৩) **ইম্পীচমেন্ট** — কংগ্রেস প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে 'ইম্পীচমেন্ট' আনতে পারে।

(৪) **ভেটো নাকচ** — কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত বিলে রাষ্ট্রপতি ভেটো দিলে তার কারণ জানিয়ে ১০ দিনের মধ্যে তিনি বিলটি কংগ্রেসে ফেরৎ পাঠাতে বাধ্য। এরপর কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিলটি পুনরায় গ্রহণ করলে তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়াই আইনে পরিণত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির ফলে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রপতি হলেন দেশ ও জাতির প্রতিনিধি। কংগ্রেসের সদস্যরা হলেন আঞ্চলিক প্রতিনিধি। তাই দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য থাকতে পারে। উভয়ের মধ্যে বিরোধও মাঝে মাঝে ঘটে। আবার উভয়ের মধ্যে সহযোগিতাও দেখা যায়।

১০২.৯ সারাংশ

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস যথাক্রমে শাসন ও আইনবিভাগের ক্ষমতা ভোগ করেন। সংবিধানে রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা, কার্যকাল, পদচ্যুতি ও নির্বাচন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হলে বা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে বা রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হলে উপরাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি হলেন একক শাসক এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী। শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি আইন, অর্থ, জরুরী অবস্থাকালীন ক্ষমতা ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দলের নেতা, রাষ্ট্রপ্রধান, জনগণের প্রতিনিধি এবং বিশ্বরাজনীতির নিয়ামক। তবে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির দ্বারা তাঁর ক্ষমতা নানাভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান বহির্ভূত কিছু কিছু ক্ষমতাও যুক্ত হয়েছে। যেমন — বিচারের রায়, কংগ্রেস প্রণীত আইন, দলব্যবস্থা, যুদ্ধ ও সংকটকালীন পরিস্থিতি, জনমতের সমর্থন, সরকারী দায়দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রপতিদের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির মাধ্যমে।

জনপ্রতিনিধিসভা ও সেনেট নিয়ে কংগ্রেস গঠিত হয়। কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নানা ক্ষমতার মধ্যে

আছে—আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ, বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা, শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী, নির্দেশদান ও তত্ত্বধান, প্রতিনিধিত্ব, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, তদন্ত, যুদ্ধ ও তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত কাজ। তবে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি দ্বারা কংগ্রেসের ক্ষমতার ওপর কিছু সীমাবদ্ধতাও আরোপিত হয়েছে।

কংগ্রেসে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পদ্ধতিটি সংবিধানে আলোচিত হয়েছে। দুই কক্ষে গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরই আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতির ভিটো ক্ষমতা আছে।

রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। কংগ্রেসও রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। উভয়ের মধ্যে বিরোধও মাঝে মাঝে ঘটে। তা সত্ত্বেও উভয়ের সম্বন্ধ সহযোগিতামূলক।

১০২.১০ প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি আলোচনা করুন।

২। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী ও ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলি কী কী?

৪। মার্কিন কংগ্রেসের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৫। কংগ্রেসের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী?

৬। মার্কিন কংগ্রেসে আইনপাশের পদ্ধতিটি আলোচনা করুন।

৭। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) রাষ্ট্রপতির কার্যাকালের মেয়াদ কত বছর? তিনি কতবার নির্বাচিত হতে পারেন?

(খ) রাষ্ট্রপতির 'ইম্পীচমেন্ট' পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

(গ) রাষ্ট্রপতির 'ভিটো' প্রয়োগ ক্ষমতা আলোচনা করুন।

(ঘ) রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন কেন পরোক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে?

(ঙ) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার কী কী সীমাবদ্ধতা আছে?

(চ) জনপ্রতিনিধিসভা কীভাবে গঠিত হয়?

(ছ) সেনেট কীভাবে গঠিত হয়?

(জ) কংগ্রেস কীভাবে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করে?

১০২.১১ উত্তরমালা

১। ৯৮.৩ দেখুন। ২। ৯৮.৪ এ উত্তর আছে। ৩। ৯৮.৪.১ দেখুন। ৪। ৯৮.৫ ও ৯৮.৬ এ উত্তর খুঁজুন। ৫। ৯৮.৬.১ খুঁজুন। ৬। ৯৮.৭ দেখুন। ৭। ৯৮.৮ এ উত্তর আছে। (ক) ৯৮.২ থেকে বার করুন। (খ) ৯৮.২ এ তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেখুন। (গ) ৯৮.৩ এর শেষ পরিচ্ছেদের আগের পরিচ্ছেদ দেখুন। (ঘ) ৯৮.৪ এর মধ্যে (২) (ঘ) দেখুন। (ঙ) ৯৮.৪.১ এ খুঁজুন। (চ) ৯৮.৫ এর মধ্যে আছে। (ছ) ৯৮.৫ এর মধ্যে বার করুন। (জ) ৯৮.৮ এ শেষ অংশে বার করুন।

১০২.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১। Brownlow, L–The President and Presidency.

২। Lorki, H.G.—The American Presidency.

৩। Munro—The Govt. of the United States.

৪। Ogg, FA & Ray, P.O—Essentials of American Govt.

৫। Hayman, S—The American President.

৬। Potter, Allen M—American Govt. and Politics.

৭। মহাপাত্র, অনাদিকুমার—নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।

একক ১০৩ ❑ আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট

গঠন

১০৩.০ উদ্দেশ্য

১০৩.১ প্রস্তাবনা

১০৩.২ সুপ্রীম কোর্টের গঠন, বিচারপতিদের যোগ্যতা, কার্যকাল ও অপসারণ পদ্ধতি

১০৩.৩ সুপ্রীম কোর্টের এলাকা ও ক্ষমতা

১০৩.৪ সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা

১০৩.৫ সুপ্রীম কোর্টের সমালোচনা ও মূল্যায়ন

১০৩.৬ সারাংশ

১০৩.৭ প্রশ্নাবলী

১০৩.৮ উত্তরমালা

১০৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১০৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা। এককটি পড়লে আপনার গোচরে আসবে —

- সুপ্রীম কোর্টের গঠন, বিচারপতিদের যোগ্যতা, কার্যকাল ও অপসারণ পদ্ধতি।
- সুপ্রীম কোর্টের এলাকা ও ক্ষমতা।
- সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন ভূমিকা।
- সুপ্রীম কোর্টের সমালোচনা ও মূল্যায়ন।

১০৩.১ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। মার্কিন বিচারব্যবস্থার শীর্ষে সুপ্রীম কোর্টের অবস্থান। সংবিধান বিচারপতিদের সংখ্যা স্থির করে দেয় নি। মাঝে মাঝে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে বিচারপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে একজন প্রধান বিচারপতি ও আটজন সহকারী বিচারপতিকে

নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হয়। সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদনক্রমে বিচারপতিরা রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। বিচারপতিদের যোগ্যতা বা কার্যকাল সম্বন্ধে সংবিধানে কিছু লেখা নেই। ফলে রাষ্ট্রপতি নিজ দলের মধ্য থেকে বিচারপতি নিয়োগ করতে পারেন। তবে রাষ্ট্রপতির দলের সমর্থক নন, এমন বিচারপতির নজিরও দেখা যায়। বিচারপতিরা সাধারণতঃ ব্যবহারজীবি হন। বিচারপতিরা একবার নিযুক্ত হলে আমৃত্যু পদে বহাল থাকেন। অসদাচরণের জন্য ইম্পীচমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁদের পদ চ্যুত করা যায়।

সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকায় মামলা সরাসরি সুপ্রীম কোর্টের কাছে যায়। কূটনৈতিক প্রতিনিধি সংক্রান্ত মামলা বা যে মামলায় কোন একটি অঙ্গরাজ্য পক্ষ থাকে, সেই সব মামলা সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকায় বিচার্য। তাছাড়াও আপীলের মাধ্যমে অধস্তন আদালত থেকে মামলা সুপ্রীম কোর্টের আপীল এলাকায় আনা যায়।

সুপ্রীম কোর্ট একাধারে সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা, নাগরিক অধিকারের সংরক্ষক, সংবিধানের বিকাশে সহায়ক, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বৃদ্ধিকারক এবং নীতি নির্ধারণকারী। আমেরিকার জাতীয় জীবনে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১০৩.২ সুপ্রীম কোর্টের গঠন, বিচারপতিদের যোগ্যতা, কার্যকাল ও অপসারণ পদ্ধতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থার শীর্ষে সুপ্রীম কোর্টের অবস্থান। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের সংখ্যা সংবিধান নির্দিষ্ট করে দেয়নি। কংগ্রেস আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিচারপতিদের সংখ্যা স্থির করে। প্রথমে ১৭৮৯ সালে প্রণীত বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত আইন অনুসারে ১ জন প্রধান বিচারপতি ও ৫ জন অন্যান্য বিচারপতি নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হয়। ১৮০৭ সালে বিচারপতিদের সংখ্যা বাড়িয়ে ৭ জন করা হয়। ১৮৬৯ সালে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে বিচারপতিদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়। তখন থেকে সুপ্রীম কোর্ট ১ জন প্রধান বিচারপতি ও ৮ জন সহকারী বিচারপতি নিয়ে গঠিত হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের অনুমোদন ক্রমে রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। বিচারের সময় অন্ততঃ ৬ জন বিচারপতির উপস্থিতি প্রয়োজন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের সমর্থনে সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্তগ্রহণ করে।

বিচারপতিদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সংবিধানে কিছু লেখা নেই। বিচারপতিদের যে ব্যবহারজীবি হতে হবে তাও নয়। তবে সাধারণতঃ ব্যবহারজীবিদের মধ্য থেকেই বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। নির্দিষ্ট যোগ্যতার নির্দেশ না থাকায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সময় রাজনৈতিক প্রভাব কার্যকরী হতে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন নিজ দলের সদস্যদের মধ্য থেকেই বিচারপতি নিয়োগ করতেন। পরবর্তী রাষ্ট্রপতিরাও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন। তবে রাষ্ট্রপতির দলের লোক নন, এমন বিচারপতিরও দৃষ্টান্ত আছে।

সংবিধান বিচারপতিদের কার্যকাল নির্দিষ্ট করে দেয়নি। তাই একবার নিযুক্ত হলে বিচারপতিরা

আমৃত্যু স্বপদে বহাল থাকেন। সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি দশ বছর পর বা ৭০ বছর বয়সে পুরো বেতনসহ অবসরগ্রহণ করতে পারেন।

দেশদ্রোহিতা, উৎকোচগ্রহণ বা অন্য কোন ধরনের অসদাচরণের জন্য ইম্পীচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ করা যায়। অসদাচরণের অভিযোগটি প্রথমে জনপ্রতিনিধিসভায় পেশ করতে হয়। তারপর তা সেনেটে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে অনুমোদিত হতে হয়।

১০৩.৩ সুপ্রীম কোর্টের এলাকা ও ক্ষমতা

মার্কিন সংবিধান অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের দুধরনের এলাকা আছে — (১) **মূল এলাকা** — মূল এলাকার মামলাগুলি সরাসরি সুপ্রীম কোর্টের কাছে যায়। সংবিধানে ৩ [২(২)] নং ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রদূত বা অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও কনসাল সম্পর্কিত মামলা কিংবা যে মামলায় কোন অঙ্গরাজ্য পক্ষ থাকে, সেইসব মামলা সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকায় অন্তর্ভুক্ত। ফলে মূল এলাকায় চার ধরনের মামলা হতে পারে — (ক) কোন অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মামলা; (খ) অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে অঙ্গরাজ্যের মামলা; (গ) রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধি সংক্রান্ত মামলা; (ঘ) এক অঙ্গরাজ্যের নাগরিকের সঙ্গে অন্য কোন অঙ্গরাজ্যের নাগরিক বা বিদেশীর মামলা এবং কংগ্রেস আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকা হ্রাসবৃদ্ধি করতে পারে না।

(২) **আপীল এলাকা** — সুপ্রীম কোর্টের অধিকাংশ মামলার বিচার হয় আপীল আদালতে। অধস্তন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় আপীল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত আছে এমন সব অঙ্গরাজ্যের আদালতের মামলার রায়ের বিরুদ্ধেও সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। সুপ্রীম কোর্ট সাধারণতঃ আপীলের অনুমতিদানের জন্য উৎপ্রেষণ ও লেখ জারি করে থাকে।

আইনপ্রণয়ন করে কংগ্রেস সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকার বৃদ্ধি করতে না পারলেও আপীল এলাকার পরিধি বাড়াতে পারে। নিম্ন আদালতের বা ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায় না। অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারের পরই সুপ্রীম কোর্টে মামলা আনা যায়। যে সব মামলায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান বা স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘিত হয়, সেইসব রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়।

১০৩.৪ সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূমিকা প্রধানতঃ পাঁচ দিক থেকে আলোচিত হতে পারে ঃ-

(১) সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে ভূমিকা — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন

প্রবর্তিত হওয়ায় এখানে সংবিধানের প্রাধান্য দেখা যায়। মার্কিন সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। সরকারের শাসন আইন ও বিচারবিভাগকে সংবিধানের নির্দেশানুসারে নিজ নিজ সাংবিধানিক ক্ষমতার গন্ডীর মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংবিধান বিরোধী বা ন্যায়নীতি বিরোধী কোন কাজ করলে সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতাকে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা বলা হয়।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার দুটি দিক আছে — (ক) সংবিধান বিরোধী হলে আইনসভা প্রণীত যে কোন আইন বা শাসনবিভাগের যে কোন আদেশ, নির্দেশ ও কাজকে সুপ্রীম কোর্ট বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে।

(খ) 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' অনুসৃত হচ্ছে কিনা সুপ্রীম কোর্ট সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখে। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধন অনুসারে, 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার কোন ব্যক্তিকে তার স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। চতুর্দশ সংশোধনের মাধ্যমে অঙ্গরাজ্যগুলির সরকারগুলির ওপরও অনুরূপ বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে। 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' অনুসারে বিচার করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট কেবলমাত্র আইনটি সংধিানসম্মত পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে কিনা তার বিচার করে না, আইনটি স্বাভাবিক ন্যয়নীতিবোধ বিরোধী যে কোন আইনকে সুপ্রীম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে। অন্য কোন দেশের সর্বোচ্চ আদালত ন্যায়নীতি বিরোধী বলে কোন আইনকে বাতিল করতে পারে না।

বিচারবিভাগীয় পর্যলোচনার ক্ষমতার জোরে সুপ্রীম কোর্ট একটি শক্তিশালী তৃতীয় কক্ষে পরিণত হয়েছে। সংবিধান প্রণেতারা সুপ্রীম কোর্টকে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রদান করে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বিরোধীতা করেছেন বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। তবে এই সমোলোচনা অনেকে মানেন না। হ্যামিল্টনের মতে, সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা হল আদালতের যুক্তিসঙ্গত ও বিশেষ ক্ষমতা। ১৮০৩ সালে মারবারী বনাম ম্যাডিসন মামলার রায়দান প্রসঙ্গে বিচারপতি মার্শাল বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। তাই এর অবস্থান আইনসভা প্রণীত আইনের উর্ধ্বে। বিচারপতিরা যেহেতু সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য শপথ নেন, তাই স্বাভাবিক ভাবেই আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা তাঁদের আছে। যে কোন সংবিধানবিরোধী আইনকে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বাতিল করে দিতে পারেন। এই ক্ষমতাকে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় বা কংগ্রেস প্রণীত আইনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন, রাজ্য সরকারের কাজ এবং রাজ্যের সংবিধানকেও বাতিল করে দিতে পারে।

(২) নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে ভূমিকা — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টকে "নাগরিক অধিকার সংহের সংরক্ষক" বলা হয়। মূল সংবিধানে নাগরিক অধিকারের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু সংবিধানের প্রথম ১০টি সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নাগরিকরা যে সকল অধিকার ভোগ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ধর্মের অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা ইত্যাদি।

সংবিধানের নবম সংশোধনে বলা হয়েছে যে সংবিধানে বর্ণিত অধিকার ছাড়াও নাগরিকরা স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন অনুসারে কোন অঙ্গরাজ্য নাগরিকদের সুযোগসুবিধা বা অধিকার ক্ষুন্ন করতে পারবে না। তাছাড়া 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তার জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

মার্কিন নাগরিকদের ঐসব অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার রক্ষার দায়িত্বপালন করে। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইনসভার বা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোন আদেশ বা নির্দেশকে নাগরিক অধিকার বিরোধী মনে করলে সুপ্রীম কোর্ট সেগুলিকে বাতিল করে দিতে পারে।

সুপ্রীম কোর্ট এই নাগরিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে পালন করে আমেরিকায় গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন যে সুপ্রীম কোর্ট শ্রমজীবি নাগরিকদের অধিকার রক্ষার বদলে কার্যতঃ ধনী বণিক শ্রেণীর স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষায় বেশী মনোযোগী। ১৮৯৫ সালে পোলক বনাম ফারমার্স লোন অ্যাণ্ড ট্রাস্ট কোম্পানীর মামলায় আয়কর ধার্য করাকে সম্পত্তিশালীদের ওপর অত্যাচার বলে সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করে। ১৯০৫ সালে লোচ্নার বনাম নিউ ইয়র্কের মামলায় সুপ্রীম কোর্ট বলে যে শ্রমিকের কাজের সময়সীমা নির্ধারণের কোন ক্ষমতা সরকারের নেই। এরূপ করার অর্থ শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতাকে খর্ব করা। এইভাবে সুপ্রীম কোর্ট শ্রমিক শোষণের রাস্তা দেখায়। দীর্ঘকাল ধরে সুপ্রীম কোর্ট সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও অধিকার বিরোধী অনেক রায় প্রদান করেছে।

(৩) সংবিধানের সম্প্রসারণে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা —

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা সংক্ষিপ্ত সংবিধানে শাসন পরিচালনার মূল নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করে সংবিধান ব্যাখ্যার দায়িত্ব বিচারবিভাগের হাতে অর্পণ করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সংবিধানের প্রায় প্রতিটি ধারাকে সুপ্রীম কোর্টের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ও উপধারার ব্যাখ্যা প্রদান করে কার্যতঃ সংবিধানের পরিধির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেসের হাতে 'অনুমিত ক্ষমতা' বলে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতির হাতে সরকারী কর্মচারীদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা ইত্যাদি প্রদান করেছে, যা মূল সংবিধানে ছিল না।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা — ঊনবিংশ শতক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রায়দান করে কার্যতঃ তার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। অনেক মামলায় সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করে যে জাতিগঠন ও সমাজকল্যাণকর কাজ সম্পাদনের জন্য কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। বিচারপতি মার্শাল কেন্দ্রের অনুমিত ক্ষমতা প্রসঙ্গে বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হলেও সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতার বাইরেও কিছু ক্ষমতা ভোগ করে। কেন্দ্রীয় সরকারকে তার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যেসব ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে সেগুলি

ছাড়াও যা কিছু অপরিহার্য, তা সম্পাদনের ক্ষমতা কেন্দ্রের আছে। এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার রেলপথ, জলপথ, মোটর ও বিমানপথে দ্রব্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী। এইভাবে কেন্দ্রের ক্ষমতা সংবিধান বহির্ভূত পথে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৫) নীতি নির্ধারণকারী হিসেবে ভূমিকা — মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট যখন আইন, প্রশাসনিক নির্দেশ, সন্ধি চুক্তি প্রভৃতির বৈধতা বিচার করে বা যখন কোন আইন বা প্রশাসনিক নির্দেশ বা সন্ধিচুক্তিকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করে, তখন সুপ্রীম কোর্ট কার্যতঃ সেই আইন নির্দেশ ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতির বিরোধিতা করে। এইভাবে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ১৯৫৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিগ্রো ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানকে বৈষম্যমূলক বলে বাতিল করে দেয়। ফলে এতদিন ধরে অনুসৃত বৈষম্যমূলক নীতিটির পরিবর্তনসাধন করা হয়।

(৬) যুক্তরাষ্ট্রের আদালত হিসাবে ভূমিকা — যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বা রাজ্য সরকারগুলির পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার বন্টনকে কেন্দ্র করে বিরোধের আশংকা থাকে। এই ধরনের কোন বিরোধ বাধলে তার মীমাংসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নিরপেক্ষ আদালত প্রয়োজন। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট হল এই ধরনের একটি নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। মার্কিন শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গ রাজ্যগুলির মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা করে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

তাছাড়াও মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট শাসন ও আইনবিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনকে বলবৎ করে এবং উভয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে।

সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্ররাজ্য বিরোধের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলেই সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছে।

মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকার সমালোচনাও কম হয়নি।

১০৩.৫ সুপ্রীম কোর্টের সমালোচনা ও মূল্যায়ন

সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকার সমালোচনা হিসাবে নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ

(১) সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা রাজনীতি-নিরপেক্ষ কিনা এ বিষয়ে সমালোচকরা প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা মনে করেন যে সমকালীন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সংবিধানের সঙ্গতি রক্ষায় সুপ্রীম কোর্ট উদ্যোগ নিয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতি দ্বারা বিচারপতিরা নিযুক্ত হন। বিচারপতিদের এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচারপতিদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিযুক্ত হওয়ার পরও তাঁরা সমকালীন ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে যোগ রেখে চলেন। শাসনবিভাগের কর্তা বা আইনবিভাগের সদস্যদের মত বিচারপতিদেরও নিজস্ব মতামত আছে। সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁরা সমকালীন

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হন। অনেকে মনে করেন যে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট দেশের রাজনৈতিক বা জাতীয় জোটের অংশবিশেষ। অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট হল রাজনৈতিক নেতৃত্বের অংশ।

(২) মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা নানাদিক থেকে সমালোচিত হয়েছে---

(ক) অনেক সমালোচক মনে করেন যে মার্কিন সংবিধান সুপ্রীম কোর্টের হাতে এই ক্ষমতা প্রদান করেনি। সুপ্রীম কোর্ট বৈধতা বিচারের ক্ষমতাকে নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বলে গণ্য করে এবং সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মাধ্যমেই সুপ্রীম কোর্ট এই ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। তাই সমালোচকরা বলেন, যে সুপ্রীম কোর্ট বিনা অধিকারে এই ক্ষমতা বলপূর্বক করায়ত্ত করেছে।

(খ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ মার্কিন শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে এক বিভাগ অপর বিভাগের কাজে কোন হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার মাধ্যমে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট অর্থাৎ বিচারবিভাগ অন্য দুটি বিভাগের (আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ) ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায়। এই ক্ষমতাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অস্বীকৃতি মনে করা হয়।

(গ) মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা শুধুমাত্র আইনগত এলাকার মধ্যে সীমিত নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন ও সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রেও এই ক্ষমতা দেখা যায়। তাই অনেকে সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতাকে বিচারবিভাগীয় স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মনে করেন।

(ঘ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা মার্কিন শাসনব্যবস্থায় অযথা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিচারপতিদের মানসিকতা ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়। একই বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এর ফলে মার্কিন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তার পরিবেশ দেখা যায়।

(ঙ) সুপ্রীম কোর্ট তার বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা সব সময় গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রয়োগ করে নি; বরং ধনী ও মালিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য এই ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়েছে। ফলে সুপ্রীম কোর্ট অনেক সময় জনস্বার্থের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

(চ) সুপ্রীম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক আইনের বিরোধীতা করেছে এবং প্রগতিবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

(ছ) বিচারপতিদের নিয়োগ তাঁদের রাজনৈতিক মতামত ও দলীয় আনুগত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলতঃ বিচারপতিরা রাজনৈতিক প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন না। বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষেত্রেও বিচারপতিরা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকেন।

অর্থাৎ বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা বিচারপতিদের অপ্রতিহত ও স্বৈরী ক্ষমতার অধিকারী করেছে।

(৩) নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও সুপ্রীম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছে। গৃহযুদ্ধের সময় থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিত্তবানদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উদাহরণ হিসাবে লোচনার বনাম নিউইয়র্ক (১৯০৫) মামলার উল্লেখ করা যায়। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্ট বলে যে শ্রমিকদের কাজের সময় নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারের নেই, কারণ তা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে।

মূল্যায়ন —

সুপ্রীম কোর্ট কখনও কখনও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হন, একথা অনস্বীকার্য। তবে সর্বক্ষেত্রে তা ঘটে না, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের রাজনীতি-নিরপেক্ষ ভূমিকাও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার নেতিবাচক দিকটাই সব না। এই ক্ষমতার পক্ষেও জোরালো বক্তব্য আছে—

প্রথমত ঃ সুপ্রীম কোর্ট তার সমীক্ষার ক্ষমতাকে কখনোই দায়িত্বহীনভাবে বা খেয়ালখুশীমত ব্যবহার করেনি।

দ্বিতীয়ত ঃ এই সমীক্ষার ক্ষমতার জন্যই মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সংযতভাবে চলেন। তাঁদের আশংকা থাকে যে অবৈধ কাজ আদালত দ্বারা বাতিল ঘোষিত হতে পারে।

তৃতীয়ত ঃ আদালতের সিদ্ধান্তকে কংগ্রেস আইন করে বদলে দিতে পারে। কাজেই সুপ্রীম কোর্ট অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী, এই বক্তব্য ঠিক নয়।

চতুর্থত ঃ সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মাধ্যমেই নিগ্রোদের অধিকার ও মর্যাদা অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের স্বৈরচারিতা থেকে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ফলে সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে।

পঞ্চমত ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধের মীমাংসা করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ষষ্ঠতঃ মার্কিন সংবিধানের বিকাশে সুপ্রীম কোর্টের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট পরিবর্তিত সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছে।

সপ্তমত ঃ সুপ্রীম কোর্ট বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার মাধ্যমে নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেছে। যখন সুপ্রীম কোর্ট কোন আইনকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে, তখন সুপ্রীম কোর্ট সেই আইনটির সঙ্গে যুক্ত নীতির বিরোধিতা পরে। এইভাবেই সুপ্রীম কোর্টের নীতি নির্ধারকের ভূমিকা কার্যকরী হয়। কতকগুলি ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় সুপ্রীম কোর্ট সফল হয়েছে। নিগ্রো ছাত্রদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বাতিল, অশ্লীল চলচ্চিত্র ও সাহিত্যকর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত জনজীবনকে প্রভাবিত করেছে।

কাঠামো ও কার্যগত দিক থেকে গত শতাব্দী জুড়ে সুপ্রীম কোর্ট তার বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিজেকে সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে এবং ন্যায় বিচারের ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে।

১০৩.৬ সারাংশ

আমেরিকায় বিচারব্যবস্থার শীর্ষে সুপ্রীম কোর্টের অবস্থান। সুপ্রীম কোর্ট বর্তমানে একজন প্রধান বিচারপতি ও আট জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত হয়। বিচারপতিরা সাধারণতঃ ব্যবহারজীবি হন এবং আমৃত্যু পদে বহাল থাকেন। তবে অসদাচরণের জন্য ইম্পীচমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বিচারপতিদের পদচ্যুত করা যায়।

সুপ্রীম কোর্টের দুধরনের এলাকা আছে — মূল এলাকা ও আপীল এলাকা। মূল এলাকায় কূটনৈতিক প্রতিনিধি সংক্রান্ত এবং কেন্দ্র-রাজ্য বা রাজ্য-রাজ্যের বিরোধী সংক্রান্ত মামলা সরাসরি উত্থাপিত হয়। আপীল এলাকায় অধস্তন বিচারালয় থেকে আপীলের মাধ্যমে মামলা সুপ্রীম কোর্টে আসে। যে সকল মামলায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান বা স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘিত হয়, সেইসব রায়ের বিরুদ্ধে অধস্তন আদালত থেকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়।

সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক, মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক, সংবিধানের সম্প্রসারণে সহায়ক, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিকারক এবং নীতি নির্ধারণকারী। আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্ট যে কোন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের আইন বা শাসনবিভাগীয় কাজকে আইনগত পদ্ধতি ও স্বাভাবিক ন্যায়নীতি — এই দুই দিক থেকে বিচার করে এবং যে কোন দিক থেকে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে করলে সেই আইন বা শাসনসংক্রান্ত কাজকে নাকচ করে দিতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের এই জাতীয় বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টকে আইনসভার তৃতীয় কক্ষে পরিণত করেছে। কোন আইন আইনসভার দুকক্ষে পাশ হওয়ার পরও তা থাকবে কিনা এ ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থাকে। আইনটি সংক্রান্ত একটি মামলা সুপ্রীম কোর্টে এলে এবং সুপ্রীম কোর্ট তাকে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির ভিত্তিতে বিচার করে তাকে নাকচ না করলে তারপরই আইনটি থাকবে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। আমেরিকার জনজীবনে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি এবং তৃতীয় কক্ষের ভূমিকায় সুপ্রীম কোর্টের অবস্থানের জন্য অনেকে সুপ্রীম কোর্টকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন।

১০৩.৭ প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও ক্ষমতা আলোচনা করুন।

২। সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকাকে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করুন।

৩। সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকার একটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ন লিখুন।

৪। **সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বর্তমানে কত?

(খ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের কার্যকাল কতদিন?

(গ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা কিভাবে পদচ্যুত হতে পারেন?

(ঘ) 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি'র অর্থ বিশ্লেষণ করুন।

(ঙ) মূল এলাকায় কি ধরনের মামলা সুপ্রীম কোর্টে আসে?

(চ) কোন ধরনের মামলা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়?

(ছ) সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা কতটা?

(জ) সুপ্রীম কোর্ট কিভাবে মৌলিক অধিকার রক্ষা করে?

(ঝ) সংবিধানের সম্প্রসারণের ও কেন্দ্রীয় সরকারী ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা আলোচনা করুন।

১০৩.৮ উত্তরমালা

প্রশ্ন ১। ৯৯.২ ও ৯৯.৩ দেখুন।

২। ৯৯.৪ এ উত্তর আছে।

৩। ৯৯.৫ দেখে লিখুন।

৪। (ক) ৯৯.২ এব প্রথম পরিচ্ছেদ উত্তর আছে।

(খ) ৯৯.২ এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখুন।

(গ) ৯৯.২ এর শেষ পরিচ্ছেদ দেখে লিখুন।

(ঘ) ৯৯.৪ এর ১(খ) দেখুন।

(ঙ) ৯৯.৩ এর (২) দেখুন।

(চ) ৯৯.৪ এর (১) দেখুন।

(ছ) ৯৯.৪ এর (২) দেখুন।

(জ) ৯৯.৪ এর ২ এর মাঝামাঝি জায়গায় দেখুন।

(ঝ) ৯৯.৪ এব (৩) ও (৪) দেখুন।

১০৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। Allen M. Potter — American Govt. and Politics.

২। A M Schlesinger — The Supreme Court.

৩। C.A. Beard — The Supreme Court and the Constitution.

৪। Ogg F.A. & Ray P.O. — Essentials of American Govt.

৫। অনাদিকুমার মহাপাত্র — নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।

একক ১০৪ ❑ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠী

গঠন

১০৪.০ উদ্দেশ্য

১০৪.১ প্রস্তাবনা

১০৪.২ মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ

১০৪.৩ মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

১০৪.৩.১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্বের কারণ

১০৪.৩.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলব্যবস্থার পরিণাম

১০৪.৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

১০৪.৫ মার্কিন ও ব্রিটিশ দলব্যবস্থার তুলনা

১০৪.৫.১ সাদৃশ্য

১০৪.৫.২ বৈসাদৃশ্য

১০৪.৬ মার্কিন স্বার্থ গোষ্ঠীর উদ্ভব

১০৪.৭ মার্কিন স্বার্থ গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

১০৪.৮ মার্কিন স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির কার্যপদ্ধতি

১০৪.৮.১ মার্কিন স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের নির্ধারক

১০৪.৯ মার্কিন ও ব্রিটিশ স্বার্থ গোষ্ঠীর মধ্যে তুলনা

১০৪.৯.১ সাদৃশ্য

১০৪.৯.২ বৈসাদৃশ্য

১০৪.১০ সারাংশ

১০৪.১১ প্রশ্নাবলী

১০৪.১২ উত্তরমালা

১০৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১০৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থ গোষ্ঠীর সঙ্গে আপনার পরিচয় স্থাপন। এককটি পড়লে আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন —

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী।
- মার্কিন ও ব্রিটিশ দল ব্যবস্থার তুলনার ভিত্তিতে উভয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।
- মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীর উদ্ভব ও শ্রেণীবিভাগ
- মার্কিন স্বার্থ গোষ্ঠীর কার্যপদ্ধতি ও তাদের কাজের নির্ধারক।
- মার্কিন ও ব্রিটিশ স্বার্থগোষ্ঠীর তুলনার ভিত্তিতে উভয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

১০৪.১ প্রস্তাবনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান নিয়ে আলোচনার সময় হ্যামিল্টনের ফেডারেলিস্ট ও জেফারসনের অ্যান্টি ফেডারেলিস্ট গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। অ্যান্টি ফেডারেলিস্ট গোষ্ঠী থেকে সাধারণতন্ত্রী দলের উদ্ভব হয়। এই দল অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারকে সমর্থন করে। ফেডারেলিস্ট গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত ফেডারেলিস্ট দল কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতাশালী করতে চেয়েছিল। কিন্তু ১৮১৬ সালে ফেডারেলিস্ট দল বিলুপ্ত হয়। তবে সাধারণতন্ত্রী দলের দুটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে — গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী ও জাতীয় সাধারণতন্ত্রী। প্রথম দলটি পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক দল এবং দ্বিতীয় দলটি সাধারণতন্ত্রী দল নামগ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক দল রক্ষণশীল নীতি নেয় ও দাসপ্রথা সমর্থন করে, সাধারণতন্ত্রী দল সংস্কারপন্থী নীতি নিয়ে দাসপ্রথার বিরোধিতা করে। এখনও আমেরিকায় এই দুটি দলই আছে। তবে উভয় দলই সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নীতির পরিবর্তন করেছে। বর্তমানে দল দুটির মধ্যে নীতিগত পার্থক্য খুব কম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছোটখাট অন্যান্য দল থাকলেও দ্বিদল ব্যবস্থাই প্রাধান্য লাভ করেছে। উভয় দলই নির্বাচনকেন্দ্রীক এবং উভয় দলেরই উদ্দেশ্য নির্বাচনে জিতে সরকারী ক্ষমতালাভ। উভয় দলের সংগঠন বিকেন্দ্রীভূত। রাজ্যদলের প্রাধান্য থাকায় দলীয় সংহতি ও শৃঙ্খলা দুর্বল। এজন্য সেখানে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি খুব শক্তিশালী।

মার্কিন উদারনীতিবাদী সমাজে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সমাজের বিভিন্ন অংশের স্বার্থের সংরক্ষণ করে। তাদের উদ্দেশ্য সরকারী ক্ষমতালাভ নয়, সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান দলের কোন কঠোর মতাদর্শ নেই, দলীয় শৃঙ্খলাও নেই। ফলে সেখানে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি খুব শক্তিশালী।

স্বার্থগোষ্ঠীগুলি কাজ আদায়ের জন্য নির্বাচনমূলক, প্রচারমূলক, লবিং ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। মার্কিন শাসনব্যবস্থায় তাদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১০৪.২ মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ

সাধারণতঃ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলীয় ব্যবস্থাকে অপরিহার্য মনে করা হয়। কিন্তু মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা ব্রিটিশ সরকারের দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের কারণ হিসাবে সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলিকে দায়ী করেন এবং তাই দলব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। কিন্তু সংবিধানের কাঠামো নিয়ে আলোচনার সময় হ্যামিল্টন ও তাঁর সমর্থকরা যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার কথা বলেন। অন্যদিকে জেফারসন ও তাঁর সমর্থকরা অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যরক্ষাকে গুরুত্ব দেন। এইভাবে প্রতিনিধিরা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় — হ্যামিল্টনের ফেডারেলিস্ট বা যুক্তরাষ্ট্রীয় দল ও জেফারসনের অ্যান্টিফেডারেলিস্ট বা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিরোধী দল।

নবগঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাতে দলীয় সংকীর্ণতার শিকার না হয় সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর ক্যাবিনেটে হ্যামিল্টন ও জেফারসন উভয়কেই স্থান দেন। তবে সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি হ্যামিল্টনের সঙ্গে চলতে থাকেন এবং জেফারসনের বিরোধী হয়ে পড়ে। ১৭৯৩ সালে জেফারসন মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে রিপাবলিকান বা সাধারণতন্ত্রী দল গঠন করেন। এই দল অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও তাদের অধিকার সংরক্ষণকে সমর্থন করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় দল কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিল। ১৮০০ সালে জেফারসন রাষ্ট্রপতি হন। তখন থেকে সাধারণতন্ত্রী দলের প্রভাব বাড়তে থাকে। নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রীয় দলের প্রভাব কমতে থাকে এবং ১৮১৬ সালে এই দলের বিলুপ্তি ঘটে।

সাধারণতন্ত্রী বা রিপাবলিকান দলের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী দেখা দেয় —

(১) ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান বা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী এবং

(২) ন্যাশান্যল রিপাবলিকান বা জাতীয় সাধারণতন্ত্রী গোষ্ঠী।

গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী গোষ্ঠী পরে গণতান্ত্রিক দল নামে অভিহিত হয়। জাতীয় সাধারণতন্ত্রী গোষ্ঠীর নাম হয় উদারনৈতিক বা হুইগ দল। পরে এই দল রিপাবলিকান পার্টি বা সাধারণতন্ত্রী দল নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রথম থেকেই ডেমোক্রাটিক পার্টি বা গণতান্ত্রিক দল রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করতে থাকে আর সাধারণতন্ত্রী দল সংস্কারমূলক নীতির কথা বলে। রাষ্ট্রপতি লিংকনের সময় দাসত্বপ্রথাকে কেন্দ্র করে উভয় দলের বিরোধিতা চলে। রক্ষণশীল গণতন্ত্রী দল দাসপ্রথাকে সমর্থন জানায় আর সংস্কারপন্থী সাধারণতন্ত্রী দল দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদের কথা বলে। গণতান্ত্রিক দল দক্ষিণের ভূস্বামী ও দাসমালিকদের পক্ষ নেয় আর সাধারণতন্ত্রী দল উত্তরের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করে। লিংকনের সাধারণতন্ত্রী দলের নেতৃত্বে গৃহযুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে আমেরিকায় শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি জোরদার হতে থাকে।

বর্তমানেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ও সাধারণতন্ত্রী এই দুটি দলই আছে। এখন উভয় দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য খুব কম। আগেকার সংস্কারপন্থী সাধারণতান্ত্রিক দলের মধ্যেও রক্ষণশীলতার নীতি গৃহীত হয়েছে। গণতান্ত্রিক দলও নানাদিক থেকে সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে উভয় দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্যকে গুরুত্বহীন বলা যায়।

১০৪.৩ মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য মার্কিন দলব্যবস্থাকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে। সেগুলি হল ঃ—

(১) মার্কিন দলীয় ব্যবস্থাকে দ্বিদলীয় বলা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় স্তরে গণতান্ত্রিক ও সাধারণতন্ত্রী — এই দুটি দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দুটি বড় দল ছাড়াও অনেক ছোটখাট দল আছে, যেমন সাম্যবাদী দল, শ্রমিক দল, সমাজতন্ত্রী দল ইত্যাদি। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে এগুলির প্রভাব খুব কম। মার্কিন সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর বহু ঘটনা ঘটেছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, আর্থিক মন্দা, মৌলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ইত্যাদি। কিন্তু জাতীয় স্তরে শাসন-ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা গণতান্ত্রিক ও সাধারণতান্ত্রিক — এই দুটি দলের মধ্যেই সীমিত থেকেছে।

(২) রবার্ট ডালের মতে, ইউরোপীয় দেশগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যেরূপ সুস্পষ্ট মতাদর্শ ও কর্মসূচীগত পার্থক্য আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গণতান্ত্রিক ও সাধারণতন্ত্রী দলের মধ্যে তা দেখা যায় না। বস্তুত, সেখানে গণতান্ত্রিক ও সাধারণতন্ত্রী দলের মধ্যে চিন্তা, মতাদর্শ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি, কর্মসূচী, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। উভয় দলই পুঁজিবাদে বিশ্বাসী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত এবং উভয় দলের কার্যপদ্ধতিও এক ধরনের। উভয় দলই নির্বাচনকেন্দ্রিক এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ। ফাইনার বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র একটি দলই আছে — সাধারণতন্ত্রী-গণতান্ত্রিক দল। একই দলের দুটি অংশ পৃথক পৃথক নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। অ্যালমণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে তাই 'অস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা' বলে।

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশাল আয়তন এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থের বিভিন্নতার জন্য সেখানে আঞ্চলিক সংগঠনগুলির গুরুত্ব খুব বেশি। তাছাড়াও, সংবিধান অনুসারে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে অঙ্গরাজ্যগুলি। ফলে রাজনৈতিক দলগুলি অঙ্গরাজ্যের নিয়ন্ত্রণমূলক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, কেন্দ্রীয় আইন দ্বারা নয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় সমস্যা কিছুটা প্রাধান্য পায়। কিন্তু অন্যান্য নির্বাচনে আঞ্চলিক সমস্যাগুলিই ভোটদাতাদের কাছে গুরুত্বলাভ করে। রাজনৈতিক দলগুলিও প্রার্থীদের অনুকূলে সমর্থন আদায়ের জন্য আঞ্চলিক ও স্থানীয় সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব দেয়। সাধারণতন্ত্রী দল মূলত উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের এবং গণতান্ত্রিক দল দক্ষিণাঞ্চলের রাজনৈতিক দল হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে উভয়

দলই আঞ্চলিকতাকে বাদ দিয়ে জাতীয় ভিত্তিতে রাজনীতিকে প্রভাবিত করার নীতি গ্রহণ করছে।

(৪) সাধারণতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক উভয় দলেরই সংগঠন বিকেন্দ্রীভূত। কোন দলেই দলীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত নয় এবং জাতীয় নেতা রাজ্য দলের নীতি বা মনোনীত প্রার্থীর বিরোধিতা করতে পারে না। রাজ্যদলগুলি জাতীয় সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ থেকে অনেকখানি মুক্ত এবং স্বাধীনভাবে রাজ্য সংগঠন পরিচালনা করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য উভয় দলের যে কনভেনশনের ব্যবস্থা আছে, তা হল পঞ্চাশটি রাজ্যদলের কনভেনশন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় নীতি প্রাধান্য পেলেও কংগ্রেসের নির্বাচনে আঞ্চলিকভাবে প্রাধান্য দেখা যায়।

(৫) দলীয় সংহতি ও শৃঙ্খলার অভাব মার্কিন দলব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিকেন্দ্রীভূত সংগঠন, রাজ্য নেতৃত্বের প্রাধান্য ইত্যাদি মার্কিন দলীয় সংহতি ও শৃঙ্খলকে দুর্বল করেছে। জাতীয় নেতাদের পরামর্শ উপেক্ষা করেও আঞ্চলিক স্বার্থ সমর্থনের নজির আইনসভার সদস্যদের মধ্যে প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয়। দলীয় নির্দেশ অমান্য করে আইনসভার সদস্যরা আইনসভায় ভোট দিয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতির দলযুক্ত কংগ্রেসের সদস্যরা অনেক সময় রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে।

(৬) স্বার্থগোষ্ঠীর প্রাধান্য — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থ'য় স্বার্থগোষ্ঠীগুলি খুবই প্রাধান্য লাভ করে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি দলের নীতিকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। এজন্য দলের আর্থিক ব্যয়, নির্বাচনী প্রচার ইত্যাদির দায়িত্ব তারা গ্রহণ করে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কাজের সঙ্গে মার্কিন কংগ্রেস সদস্যরাও যুক্ত থাকেন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সংহতি ও শৃঙ্খলার অভাবে এই অবস্থা দেখা যায়।

(৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি দলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী গণভিত্তিক ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। জনসমর্থন লাভের জন্য দুটি দলই বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করে এবং দেশের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতামতকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে।

(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দল প্রার্থী ও নির্দল ভোটদাতাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দেশের দলীয় ব্যবস্থায় তা দেখা যায় না। সমর্থকদের মধ্যে মতাদর্শগত স্থায়ী দলীয় আনুগত্যও দেখা যায় না।

১০৪.৩.১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্বের কারণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় সাধারণতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক এই দুটি প্রধান দলকে দেখা যায়। অন্যান্য কিছু দল আছে, যেমন সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দল, কমিউনিষ্ট দল ইত্যাদি। কিন্তু তৃতীয় কোন দল রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের প্রতিযোগিতায় প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুদলীয় ব্যবস্থার বদলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রাধান্য লাভ করেছে। অন্যান্য গণতন্ত্র যেমন ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডে বহুদলীয় ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন বহুদলীয় ব্যবস্থার বদলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা দেখা যায়, তার কিছু কারণ হল ঃ--

(১) ঐতিহাসিক কারণ — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঔপনিবেশিক ইংল্যাণ্ডের হুইগ ও টোরীদের মধ্যেকার

বিরোধ, সংবিধান প্রণয়নের সময় ফেডারেলিস্ট ও ফেডারেলিস্ট বিরোধী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, কিছুকাল পর ফেডারেলিস্ট ও জেফারসনীদের মতপার্থক্য ইত্যাদি থেকেই কালক্রমে সাধারণতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক দলের সৃষ্টি হয়েছে।

(২) প্রতিষ্ঠানিক কারণ — মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনগণের আনুগত্য তিন বা তার অধিক দলের মধ্যে বিভক্ত হলে তাদের পক্ষে কোন একজনকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে বেছে নেওয়া কঠিন হয়। কারণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন প্রার্থীকে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে হয়। এই সাংবিধানিক শর্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে জাতীয় রাজনৈতিক দলের সংখ্যা সীমিত করতে সহায়তা করেছে।

(৩) সামাজিক কারণ — জাতিগত, ধর্মীয়, আর্থসামাজিক থেকে বিভক্ত সমাজে বহুদলব্যবস্থা কার্যকরী হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের বিরোধ কম হওয়ার জন্য দ্বিদলীয় ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে।

(৪) মতৈক্য — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক মতৈক্য আছে। ফলে দুটি দলের কর্মসূচীর মধ্যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নেই। কোন বিভাজন না থাকায় তৃতীয় কোন দল গড়ে উঠতে পারেনি।

(৫) মানসিক প্রবণতা — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বীতা দুটি প্রধান দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে গোড়া থেকেই নাগরিকদের মধ্যে প্রধান দুটি দলের যে কোন একটির প্রতি সমর্থনের মানসিকতা গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক নেতারাও মনে করেন যে প্রধান দুটি দলের কোন একটির সমর্থন ছাড়া রাজনৈতিক জীবনে সাফল্যলাভ সম্ভব নয়। এই মানসিক প্রবণতা দ্বিদলব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দান করেছে।

(৬) তৃতীয় দলের মধ্যে অসংহতি — তৃতীয় দলের অভ্যুত্থান সম্পর্কিত দীর্ঘদিনের আন্দোলন, প্রকৃতি, কর্মসূচী ইত্যাদি সবদিক থেকেই হতাশাজনক ও অসংহত।

১০৪.৩.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলব্যবস্থার পরিণাম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলব্যবস্থা থাকার পরিণাম হল :—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের উভয় সভার নির্বাচন বিভিন্ন সময়ে হয়। অভিনবত্ব হল যে একটি দলের প্রার্থী রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলেও অন্য দলের পক্ষে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ সম্ভব।

(২) নির্বাচনে জয়লাভের জন্য কোন দল দেশের একটিমাত্র অংশ বা একটি স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটলাভের জন্য বিভিন্ন অংশ ও গোষ্ঠীর ব্যাপকতর স্বার্থের সমষ্টিকরণ করতে বাধ্য হয়। দুটি দলই এই কাজ করে থাকে।

(৩) দুটি দল থাকায় স্বাভাবিকভাবে একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সংসদীয় ব্যবস্থার মত ত্রিশঙ্কু অবস্থা হয় না।

(৪) গণতান্ত্রিক ও সাধারণতন্ত্রী দুটি দলই প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল। ফলে প্রচলিত ব্যবস্থার স্থায়িত্বও অক্ষুণ্ণ থাকছে।

১০৪.৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হল ঃ—

(১) **নির্বাচনমূলক** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি এবং দুবছর অন্তর প্রতিনিধিসভার সদস্য এবং সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। অঙ্গরাজ্যের গভর্ণররাও নির্বাচিত হন। এই সব নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ ও সাফল্যলাভ করে রাজনৈতিক ক্ষমতাদখল হল রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান কাজ। এজন্য সাধারণতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক উভয় দলই ভোটদাতাদের সমর্থনলাভের জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করে। দলগুলিকে তাই প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনী প্রচার ইত্যাদি কাজে তারা মনোনিবেশ করে।

(২) **সমস্যা নির্বাচন** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি দলই দেশের বিভিন্ন সমস্যাসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে বাছাই করে এবং সেই সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। সমস্যা বাছাই ও তাদের সমাধান নিয়ে রচিত দলীয় কর্মসূচী ভোটদাতাদের প্রভাবিত করে।

(৩) **সরকার গঠন** — মার্কিন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে এবং অন্য দল বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে উভয় দলের মধ্যে মতাদর্শগত মৌলিক পার্থক্য না থাকায় উভয় দলই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতি গ্রহণ করে।

(৪) **সরকারের বিভাগগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি দেখা যায়। তাই সেখানে আইন ও শাসনবিভাগ পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। অথচ এই বিভাগ দুটির মধ্যে সহযোগিতা ছাড়া সুশাসন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল সেখানে আইন ও শাসনবিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করে এবং প্রশাসনকে সচল রাখে।

(৫) **সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগসাধন** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলি সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। জনগণের অভিযোগ বা দাবিসমূহ সম্বন্ধে দলগুলি সরকারকে অবহিত করে। আবার গৃহীত সরকারী ব্যবস্থা সম্বন্ধেও জনগণকে জানায়। কংগ্রেসের সদস্যরা নিজ নির্বাচকমণ্ডলীর অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সদাসচেতন থাকেন এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

(৬) **জনমতগঠন** — অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক দলের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাজনৈতিক দলগুলি জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সাধারণতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক উভয় দলই কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে জনমতকে অনুকূলে আনার চেষ্টা করে। জনমত গঠনের জন্য পত্রপত্রিকা, বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন,

সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে কংগ্রেসের কাজ, সরকারী ত্রুটি বা অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে জনমতকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে।

(৭) **জাতীয় ঐক্যসাধন** — সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতাদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মার্কিন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টা করে এবং বাস্তবে তা রূপায়ণেও ব্রতী হয়। তাই প্রতিটি দলই বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক স্বার্থকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি করে।

(৮) **রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা প্রদান** — দুটি রাজনৈতিক দলই প্রচলিত রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল। ফলে প্রচলিত ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বজায় থাকে। দলগুলি বিভিন্ন উপজাতি, সামাজিক শ্রেণী, ধর্মীয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ স্বার্থকে সংঘবদ্ধ করে গণভিত্তিক সরকার গঠন করে। তার ফলেও রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল হয়।

(৯) **পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থন** — উভয় দলই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সাম্যবাদের বিরোধিতা করে।

১০৪.৫ মার্কিন ও ব্রিটিশ দলব্যবস্থার তুলনা

মার্কিন ও ব্রিটিশ দলব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় দেশের দলব্যবস্থার সংগঠন, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভালভাবে অনুধাবন করা যায়। উভয় দলব্যবস্থার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈসাদৃশ্য আছে।

১০৪.৫.১ সাদৃশ্য

১। **দ্বিদলব্যবস্থা** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন উভয় দেশেই দ্বিদলব্যবস্থা প্রচলিত। মার্কিন দলদুটি হল গণতান্ত্রিক ও সাধারণতান্ত্রিক দল আর ব্রিটেনের দলদুটি হল রক্ষণশীল ও শ্রমিক দল। উভয় দেশেই প্রধান দুটি দল ছাড়াও অন্যান্য দল আছে। কিন্তু তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব খুবই কম। উভয় দেশেই সরকারী ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

২। **সাংগঠনিক দিক** — উভয় দেশেই দলীয় সংগঠনে কিছু সাদৃশ্য আছে। উভয় দেশেই দলীয় সংগঠন পিরামিডের মত বিভিন্ন কমিটি দ্বারা গঠিত। উভয় দেশের দুটি রাজনৈতিক দলেই জাতীয় ও আঞ্চলিক সংগঠন দেখা যায়।

(৩) **আঞ্চলিক আনুগত্য** — উভয় দেশেই দুটি দলের সমর্থকদের দলীয় আনুগত্য আঞ্চলিক ও ভৌগলিক। ব্রিটেনের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড রক্ষণশীল দলকে সমর্থন করে। উত্তর ও মধ্যাঞ্চলগুলি শ্রমিক দলের সমর্থক। আমেরিকাতে ও কৃষি খামার ও ক্ষুদ্র শহরাঞ্চলে সাধারণতন্ত্রী দল এবং দক্ষিণ ও বৃহৎ শহরগুলিতে গণতান্ত্রিক দলের সমর্থন দেখা যায়।

(৪) **সহযোগিতামূলক** — উভয় দেশেই দলগুলির মধ্যে সহনশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার মনোভাব দেখা যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক মূল্যবোধ বিষয়ে উভয় দেশেই প্রধান দলগুলির মধ্যে মতৈক্য দেখা যায়।

(৫) **রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার প্রতি আস্থা** — উভয় দলই প্রচলিত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও সংবিধান সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক. রাজনৈতিক প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই দলদুটির নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। ব্রিটেনে রক্ষণশীল দল প্রচলিত ব্যবস্থার সংরক্ষণ চায়। শ্রমিক দল সংস্কারনীতি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে সমর্থন করলেও সামগ্রিকভাবে প্রচলিত ব্যবস্থাকে বজায় রাখতেই চায়।

(৬) **বিপ্লব বিরোধীতা** — উভয় দেশের উভয় দলই বিপ্লব-বিরোধী এবং সাংবিধানিক উপায়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতার মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতা দখলে সচেষ্ট।

(৭) **স্বার্থগোষ্ঠীর সঙ্গে নিকট সম্পর্ক** — উভয় দেশেরই রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হল যে রাজনৈতিক দল স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক বর্তমান। রাজনৈতিক দলগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষক সংগঠন ইত্যাদি স্বার্থগোষ্ঠী সৃষ্ট হয়েছে এবং স্বার্থগোষ্ঠীগুলিও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী প্রচার, অর্থসরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করে।

(৮) উভয় দেশেই রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু কোন দেশেই রাজনৈতিক দল সংবিধান স্বীকৃত ব্যবস্থা নয়। সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে দলব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ব্রিটেনে পার্লামেন্টের কোন আইনের ভিত্তিতে দলব্যবস্থার সৃষ্টি হয় নি। মার্কিন লিখিত সংবিধানেও দলব্যবস্থার উল্লেখ নেই। উভয় দেশেই উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ যুক্ত।

১০৪.৫.২ বৈসাদৃশ্য

ব্রিটেন ও আমেরিকার দলব্যবস্থার মধ্যে বৈসাদৃশ্য কম নয়। বৈসাদৃশ্যগুলি হল :—

(১) **দলীয় ব্যবস্থার ভূমিকা** — ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা দলীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে সর্বাংশে দল পরিচালিত বলা যায় না। ফলে উভয়ের ভূমিকা ভিন্ন ধরনের।

ব্রিটেনে কমন্সসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, সেই দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হন। দলীয় সদস্যদের নিয়ে তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ফলে দলীয় সরকার দলীয় কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। ব্রিটেনে জাতীয় নীতি নির্ধারণে দলের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রতিষ্ঠিত। এখানে সরকার কোন

বিশেষ, দল দ্বারা পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সব সময় একই দলভুক্ত হয় না। ফলে সরকারের সঙ্গে দলের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়। রাষ্ট্রপতির দলের সদস্যরাও অনেক সময় তাঁর নীতির বিরোধিতা করেন। অন্য দলের সদস্যরা আবার কখনও কখনও তাঁকে সাহায্য করেন।

(২) আদর্শ ও কর্মসূচী — ব্রিটেনের দুটি দলের মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচীতে পার্থক্য আছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি দলের মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচীগত বিশেষ পার্থক্য নেই। ব্রিটেনের দলদুটির মধ্যে পার্থক্য আদর্শগত। আমেরিকার দলদুটির মধ্যে পার্থক্য সংগঠনগত।

(৩) দলীয় কাঠামোগত — ব্রিটেনে দল দুটি কেন্দ্রীভূত। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মত দলীয় কাঠামোও এককেন্দ্রিক। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি দলেরই প্রকৃত ক্ষমতা নিম্নস্তরে দলীয় সংগঠনের হাতে থাকে। ফলে দুটি দলই বিকেন্দ্রীভূত।

(৪) উদ্দেশ্যগত — ব্রিটেনের দুটি দলই উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সরকারী ক্ষমতা দখল করতে পারলে দল দুটি দলীয় নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ণের প্রচেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দল দুটির মধ্যে কর্মসূচী বা নীতিগত কোন পার্থক্য না থাকায় শুধুমাত্র সরকারী ক্ষমতা লাভের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে।

(৫) দলীয় শৃঙ্খলা — ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল দুটির মধ্যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও সংহতি দেখা যায়। কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনের ওপর সরকার নির্ভরশীল। দলীয় শৃঙ্খলার অভাব থাকলে সরকার বিপদের সম্মুখীন হবে। তাই সেখানে দলীয় শৃঙ্খলার প্রয়োজন। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে। কংগ্রেসের সমর্থনের ওপর সরকার নির্ভর করে না। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়।

(৬) দলীয় আনুগত্য -- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ নাগরিক পারিবারিক দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে ভোট দেন। কিন্তু ব্রিটেনে পারিবারিক ধারায় ভোটপ্রদান করা হয় না।

(৭) বিরোধী ও ক্ষমতাশালী দলের সম্পর্ক — ব্রিটেনের কমন্সসভায় সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সবসময় সংগ্রাম চলে। মার্কিন কংগ্রেসে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উভয় দলের সদস্যদের মধ্যে সমঝোতার মনোভাব দেখা যায়।

১০৪.৬ মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীর উদ্ভব

সমাজে পরস্পর বিরোধী স্বার্থের অস্তিত্ব থাকলে স্বার্থগোষ্ঠী দেখা দেয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সর্বত্রই স্বার্থগোষ্ঠী বর্তমান। মার্কিন শাসনব্যবস্থা উদারনীতিবাদী। সেখানে পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ও তাদের দ্বন্দ্বও আছে। একই শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যেও বিরোধী দেখা যায়। তাই সেখানে অনেক স্বার্থগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য সরকারী ক্ষমতালাভ নয়, সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে নিজেদের

অনুকূলে আনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতা ও কতৃত্ব ব্যাপক। যুক্তরাষ্ট্রের শাসন, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ, দুটি রাজনৈতিক দলের দুর্বল কাঠামো, কংগ্রেসে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থার প্রাধান্য ইত্যাদি স্বার্থগোষ্ঠীগুলির প্রাধান্য বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। দুটি প্রধান দলেরই নির্দিষ্ট মতাদর্শ নেই, দলীয় শৃঙ্খলারও অভাব আছে। ফলে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সহজেই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণের কেন্দ্রও অনেক। ফলে স্বার্থগোষ্ঠীগুলির সুবিধা হয়েছে। সিদ্ধান্তগ্রহণের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে তারা প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। তবে তাদের সাফল্য নির্ভর করে তাদের গোষ্ঠী সামর্থ্যের ওপর।

মার্কিন স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির সংখ্যা এত বেশি যে মার্কিন শাসনকে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহের বিকাশ ও বিস্তারের এক উল্লেখযোগ্য আবাসস্থল বলা যায়। এগুলিকে অনুধাবন না করলে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝা যায় না।

১০৪.৭ মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

নানাভাবে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

(১) কার্যকলাপের ভিত্তিতে — কার্যকলাপের ভিত্তিতে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়— অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর উদাহরণ হল কৃষি, শিক্ষা বা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংগঠন। এগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গভিত্তিক গোষ্ঠীগুলি হল অ-অর্থনৈতিক।

(২) সংখ্যা ও আর্থিক সামর্থ্যের বিচারে — সংখ্যা ও আর্থিক সামর্থ্যের দিক থেকে চার ধরনের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দেখা যায় —

(ক) কম সদস্য বিশিষ্ট, কিন্তু বিশেষ আর্থিক স্বাচ্ছল্যযুক্ত সংস্থা, যেমন, জাতীয় উৎপাদকদের সংস্থা।

(খ) অধিক সদস্যবিশিষ্ট কিন্তু কম আর্থিক স্বাচ্ছল্যযুক্ত সংস্থা, যেমন, কৃষ্ণকায়দের সংগঠন।

(গ) বিশাল সদস্যবিশিষ্ট এবং আর্থিক স্বাচ্ছল্যযুক্ত সংস্থা যেমন শ্রমিক সংস্থা।

(ঘ) কম সদস্যবিশিষ্ট কিন্তু মর্যাদাযুক্ত যেমন, আণবিক বিজ্ঞানীদের সংস্থা।

ল্যাজারাস ও গিলেকপি তিন ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর কথা বলেছেন —

(ক) সমস্যাকেন্দ্রিক স্বার্থগোষ্ঠী যা বিশেষ ঘটনা বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, যেমন, ধূমপান বিরোধীদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অ্যাকশন্ অন স্মোকিং এণ্ড হেলথ।

(খ) সরকার কেন্দ্রিক স্বার্থগোষ্ঠী বা লবিং-এর মাধ্যমে সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য গঠিত স্বার্থগোষ্ঠী। এরা আইন, শাসন ও বিচারবিভাগীয় স্তরে কাজ করে।

(গ) আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থগোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংগঠিত স্বার্থগোষ্ঠী, যেমন ধর্ম বা বর্ণভিত্তিক গোষ্ঠী।

১০৪.৮ মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কার্যপদ্ধতি

মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থ আদায়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সেগুলি হল ঃ---

(১) **নির্বাচনমূলক** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি কোন বিশেষ প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্যের জন্য ভোটসংগ্রহে তৎপর হতে পারে। এইভাবে গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়লাভ করায়। গোষ্ঠীগুলি নির্বাচনে দলগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেয়, দলীয় প্রার্থীর অনুকূলে প্রচারকাজ চালায়। নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও দলগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গোষ্ঠীর যোগ থাকতে পারে।

(২) **প্রচারমূলক কাজ** — স্বার্থগোষ্ঠীগুলি গণমাধ্যমগুলিকে (বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র ইত্যাদি) প্রভাবিত করে গোষ্ঠীস্বার্থের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য প্রচারকাজ চালায়। তাছাড়াও কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতিকে প্রভাবিত করে গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে আইনপ্রণয়নের চেষ্টা করে।

(৩) **বিচারব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার** — স্বার্থগোষ্ঠীগুলি বিচারালয়কেও প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা করে থাকে। বৃহৎ গোষ্ঠীগুলি শাসনবিভাগের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বিচারকদের নিয়োগকেও প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। তাছাড়াও স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজেরা মামলা দায়ের করতে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দায়ের করা মামলায় আর্থিক সাহায্য দিতে পারে।

(৪) গোষ্ঠীগুলি যে পদ্ধতিতে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে প্রবেশ পাওয়ার এবং নিজেদের বক্তব্য বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে তাকে লবিং বলে। স্বার্থগোষ্ঠীর পক্ষে প্রতিনিধিরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীদের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করেন ও যোগাযোগ রাখেন। শিল্পপতি, শ্রমিক ইত্যাদি সব গোষ্ঠীরই লবি আছে। মার্কিন কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটির প্রভাবশালী সদস্যদের মাধ্যমেও গোষ্ঠীগুলি উদ্দেস্যসাধনে ব্রতী হয়।

১০৪.৮.১ মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের নির্ধারক

যে কোন দেশের স্বার্থগোষ্ঠীর কাজ কয়েকটি উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই উপাদানগুলিকে স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যকলাপের নির্ধারক বলা হয়। নির্ধারকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) রাজনৈতিক সংস্কৃতি — মার্কিন রাজনৈতিক সংস্কৃতি সেখানকার স্বার্থগোষ্ঠীগুলির ভূমিকার নির্ধারক। মার্কিন জনগণ তাদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রায় স্বার্থগোষ্ঠীগুলি তাই আজ অপরিহার্য। এই অপরিহার্যতা মার্কিন রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গ।

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় — মার্কিন শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন। তাই স্বার্থগোষ্ঠীগুলিও জাতীয় ও কেন্দ্র উভয় স্তরেই কাজ করে থাকে।

(৩) ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযুক্ত হয়েছে। তাই মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলি শুধু শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে সব সময় কার্যসিদ্ধি লাভ করতে পারে না। আইনবিভাগ, বিচারবিভাগকেও তারা প্রভাবিত করে কাজ আদায়ের চেষ্টা করে।

(৪) রাজনৈতিক দল — রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী যুক্ত থাকে। রাজনৈতিক দল দ্বারা তাদের সংগঠন ও কার্যকলাপ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজনৈতিক দল স্বার্থগোষ্ঠীগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করে, স্বার্থগোষ্ঠীগুলিও রাজনৈতিক দলে নির্বাচনের প্রচারকাজে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য করে।

(৫) জনগণের মনোভাব — স্বার্থগোষ্ঠীগুলি জনগণের সামাজিক জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে জনগণ অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত করে। জনসমর্থন ও জনআনুকূল্যের ওপর গোষ্ঠীগুলির সাংগঠনিক শক্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সাফল্য নির্ভর করে।

(৬) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা — স্বার্থগোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা দ্বারা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সাফল্য নির্ধারিত হয়।

১০৪.৯ মার্কিন ও ব্রিটিশ স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনা

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা ও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক। উভয় ব্যবস্থাতেই স্বার্থগোষ্ঠীগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। উভয় দেশের স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

১০৪.৯.১ সাদৃশ্য

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় ঃ—

(১) রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ — উভয় দেশেই স্বার্থগোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

(২) উদ্দেশ্য — উভয় দেশের স্বার্থগোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য হল ক্ষমতার মূল কেন্দ্রস্থ কাঠামোকে প্রভাবিত করা, রাজনৈতিক ক্ষমতাদখল নয়। তাই তারা নীতি নির্ধারণকারী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের ওপর গোষ্ঠীস্বার্থের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করে।

(৩) উদ্দেশ্যসাধনের পন্থা — উভয় দেশের স্বার্থগোষ্ঠীগুলি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করে সেগুলি একই ধরনের। গোষ্ঠীস্বার্থকে রক্ষা করার জন্য তারা যে সকল কলাকৌশল অবলম্বন করে সেগুলি হল আইনসভার সদস্যদের ওপর প্রভাববিস্তার, প্রচারের মাধ্যমে জনমত সংগঠন, বিক্ষোভ সংগঠন ইত্যাদি।

(৪) সংহতি ও সমন্বয়ের মাধ্যম — ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয় দেশেই স্বার্থগোষ্ঠীর মাধ্যমে দেশের জনগণের বিভিন্ন স্বার্থ ব্যক্ত হয় এবং স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন স্বার্থের সংহতি ও সমন্বয়সাধন সম্ভব হয়।

(৫) বহু ধরনের গোষ্ঠী — উভয় দেশেই বিভিন্ন স্বার্থকে কেন্দ্র করে পেশাগত, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠী আছে। বহু উদ্দেশ্যসাধক গোষ্ঠী এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধক দুধরনেরই গোষ্ঠী উভয় দেশে দেখা যায়।

১০৪.৯.২ বৈসাদৃশ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের গোষ্ঠীগত স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যগুলি হল : —

(১) মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী আইনসভায় সুসংগঠিতভাবে সক্রিয় থাকে। ব্রিটেনের স্বার্থগোষ্ঠীগুলি আইনসভায় তত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে না।

(২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বিভক্ত। ফলে জাতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যস্তরে রাজ্য সরকার উভয়কেই প্রভাবিত করে স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করে মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলি। কিন্তু ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কিছু প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু তাদের ক্ষমতা খুবই কম। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকায় ব্রিটেনের স্বার্থগোষ্ঠীগুলি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় স্তরেই তাদের কাজকর্ম সীমিত করে।

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন, শাসন ও বিচারবিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়। ফলে তিনটি বিভাগ পৃথকভাবে কর্তৃত্ব কায়েম করে। তাই মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারী কাঠামোর এই তিনটি স্তরেই স্বার্থগোষ্ঠীগুলি তাদের কার্যকলাপকে সম্প্রসারিত করে। কিন্তু ব্রিটেনে নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা হিসাবে শাসনবিভাগের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। শাসনবিভাগের প্রস্তাবগুলি কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলীয় সদস্যদের দ্বারা সহজেই সমর্থিত হয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থগোষ্ঠীগুলি দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ দ্বারা উদ্দেস্যসাধনের চেষ্টা করে।

(৪) মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেসপ্রণীত আইন ও শাসনবিভাগীয় নির্দেশের বৈধতা বিচার করে এবং সংবিধান বিরোধী যে কোন আইনবিভাগীয় বা শাসনবিভাগীয় কাজকে অবৈধ বলে বাতিল করতে পারে। এই কারণে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি বিচারবিভাগীয় স্তরেও সক্রিয় থাকে। কিন্তু ব্রিটেনে পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা বা আইনকে অবৈধ ঘোষণার ক্ষমতা বিচারবিভাগের নেই। তাই সেখানে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি বিচারবিভাগীয় স্তরে কাজ করে না।

(৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতি স্বার্থগোষ্ঠীর কাজের অনুকূল। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সমস্ত গোষ্ঠীর কাজকর্মের পরিধি ব্যাপক।

(৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থগোষ্ঠীগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য দলীয় নীতি নির্ধারণের প্রচেষ্টা দেখা যায় না। তাই স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নির্বাচন ব্যবস্থার সব পর্যায়েই তাদের প্রভাবকে কার্যকরী করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্রিটেনের প্রধান দুটি দল বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীগুলির দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে দলীয় কর্মসূচী নির্ধারণ করে। তাই সেখানে স্বার্থগোষ্ঠীগুলির উদ্যোগ আয়োজন মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলির তুলনায় কম।

(৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত এবং বিশেষভাবে সংগঠিত। ব্রিটেনে কিন্তু স্বার্থগোষ্ঠীগুলি তুলনায় অনেক বেশি অসংগঠিত এবং বিশেষজ্ঞ নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত।

১০৪.১০ সারাংশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক এই দুটি দলকে প্রধান দল বলা যায়। অন্যান্য দল থাকলেও তাদের গুরুত্ব নেই। মার্কিন দ্বিদলব্যবস্থায় দলদুটির মধ্যে নীতিগত বা কর্মসূচীগত পার্থক্য খুব বেশি নেই। উভয় দলই পুঁজিবাদকে সংরক্ষণ করতে চায়। উভয় দলই নির্বাচনে বিশ্বাসী এবং বিপ্লব বিরোধী। উভয় দলেরই সংগঠন বিকেন্দ্রীভূত। উভয় দলেরই উদ্দেশ্য নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা লাভ।

উভয় দলের কা হল — রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রতিনিধিসভার সদস্য ও সেনেটের সদস্যদের নির্বাচন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর নির্বাচন, সংকারগঠন বা সরকার বিরোধিতা সরকারের বিভাগগুলির মধ্যে সংযোগসাধন, সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বিধান, জনমতগঠন, জাতীয় ঐক্যসাধন, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীলতা প্রদান এবং পুঁজিবাদের সংরক্ষণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুটি রাজনৈতিক দলের দুর্বল কাঠামো, দলীয় শৃঙ্খলার অভাব ইত্যাদি স্বার্থগোষ্ঠীকে ক্ষমতাশালী করেছে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্যে সরকারী ক্ষমতালাভ বা নির্বাচনে জয়লাভ করা নয়, সরকারকে প্রভাবিত করে সরকারী সিদ্ধান্তকে স্বার্থগোষ্ঠীর পক্ষে আনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সামাজিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে

অনেক স্বার্থগোষ্ঠী যুক্ত থাকে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক দলের প্রচার বা অন্যান্য কাজে দলগুলিকে সাহায্য করে।

১০৪.১১ প্রশ্নাবলী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২। মার্কিন দলীয়ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী কী কী?

৪। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি কি কি?

৫। স্বার্থগোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলতে কি বোঝেন? স্বার্থগোষ্ঠীগুলির শ্রেণীবিভাগ করুন।

৬। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করুন।

৭। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলব্যবস্থার অস্তিত্বের কারণগুলি কি কি?

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলব্যবস্থার পরিণামগুলি আলোচনা করুন।

(গ) মার্কিন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির কার্যপদ্ধতি আলোচনা করুন।

(ঘ) মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের নির্ধারকগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

১০৪.১২ উত্তরমালা

১। ১০০.২ এ উত্তর আছে।

২। ১০০.৩ দেখুন।

৩। ১০০.৪ খুঁজুন।

৪। ১০০.৫, ১০০.৫.১ এবং ১০০.৫.২ এ উত্তর দেওয়া হয়েছে।

৫। ১০০.৬ এবং ১০০.৭ থেকে উত্তর বার করুন।

৬। ১০০.৯, ১০০.৯.১ এবং ১০০.৯.২ থেকে উত্তর পাওয়া যাবে।

৭। (ক) ১০০.৩.১ এ উত্তর আছে।

(খ) ১০০.৩.২ এ উত্তর পাবেন।

(গ) ১০০.৮ এ উত্তর দেখুন।

(ঘ) ১০০.৮.১ পাওয়া যাবে।

১০৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১। Ogg FA & Ray P. O. — Essentials of American Govt.

২। Munro — The Govt. of United States.

৩। অনাদিকুমার মহাপাত্র — নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।

ই. পি. এস. - ৭
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের
ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
২৭

একক ১০৫ ❑ পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের ক্রমবিকাশের ধারা ও বৈশিষ্ট্য

গঠন

১০৫.০ উদ্দেশ্য

১০৫.১ প্রস্তাবনা

১০৫.২ প্রথম সাধারণতন্ত্র

১০৫.৩ প্রথম সাধারণতন্ত্রের পতন এবং
১৮০৪ সালে নেপোলিয়নের শাসন প্রতিষ্ঠা

১০৫.৪ নেপোলিয়নের পতন—জুলাই বিপ্লব - ফেব্রুয়ারি বিপ্লব

১০৫.৫ দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র — ১৮৪৮-৫২, প্যারী কমিউন

১০৫.৬ তৃতীয় সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান, ১৮৭৫

১০৫.৭ অস্থায়ী সরকার, ১৯৪৪-৪৫

১০৫.৮ প্রথম সংবিধান সভা, ১৯৪৫, দ্বিতীয় সংবিধান সভা

১০৫.৯ চতুর্থ সাধারণতন্ত্র, ১৯৪৬ — বৈশিষ্ট্য
চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের পতন, ১৯৫৮

১০৫.১০ পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১০৫.১১ সারাংশ

১০৫.১২ অনুশীলনী

১০৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১০৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি ফ্রান্সের বিপ্লবের (১৭৮৯) পর যে কয়টি সাধারণতন্ত্রের উত্থান-পতনের পর পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও প্রায় ৪৫ বছর ধরে আজও একটানা কাজ করে চলেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া এই এককের উদ্দেশ্য। ফ্রান্সের বর্তমান শাসনব্যবস্থার নাম পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। স্বভাবতই প্রশ্ন বা কৌতূহল হতে পারে যে তাহলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণ সাধারণতন্ত্র কেমন ছিল? কেনই বা পঞ্চম সাধারণতন্ত্র প্রবর্তিত হলো? এই প্রশ্ন ও কৌতূহল নিবারণ করাই এই এককের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যার পটভূমিতে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের আবির্ভাব ফ্রান্সে ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া আছে। তারপর অধুনা প্রচলিত পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

১০৫.১ প্রস্তাবনা

পৃথিবীর যে কয়টি দেশ ইতিহাস সমৃদ্ধ ও রাজনীতি-সচেতন বলে পরিচিত তার মধ্যে ফ্রান্স হচ্ছে অন্যতম। অতীতে এবং বর্তমানেও ফ্রান্স হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎশক্তি। ইউরোপীয় রাজনীতি তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফ্রান্সের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আজকের 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন'-এ ফ্রান্স হচ্ছে নেতৃত্বদানকারী দেশ।

সুতরাং ফ্রান্সের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা যে কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়। তাই ফ্রান্সের সংবিধান, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাজনীতি-প্রক্রিয়ার পঠন-পাঠন ও গভীর অনুধাবনের বিষয়।

তাই ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই এককে আধুনিক ফ্রান্সের একটি রাজনৈতিক ইতিহাসকে ক্রমানুসারে ঘটনা ও সাল ভিত্তিক অবস্থায় উপস্থাপনা করা হয়েছে। তারপর বর্তমান ফ্রান্সের সাংবিধানিক ব্যবস্থা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের ক্রমবিকাশের ধারা

১০৫.২ প্রথম সাধারণতন্ত্র

১৭৮৯ সালে লুই রাজতন্ত্রের পতনের পর ফ্রান্সের সাধারণতান্ত্রিক কাঠামো প্রবর্তিত হয়। ১৭৮৯ সালের সংবিধান ফ্রান্সের প্রথম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান। "মানুষের অধিকারের ঘোষণার" ঢক্কানিনাদে ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী অবস্থায় জাতীয় প্রতিনিধি সভা দ্বারা প্রথম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধান-এ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও এক কক্ষবিশিষ্ট নির্বাচিত আইনসভার ব্যবস্থা ছিল। ভোটাধিকার কেবলমাত্র কর প্রদানকারী নাগরিকদের মধ্যেই সীমিত ছিল।

এই সংবিধান স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবোত্তর জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এক বছর অতিবাহিত হতে না হতেই "কনভেনশন" নামে এক সার্বভৌম সভা গঠন করে নতুন সংবিধান ১৭৯৩ সালে

সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভাকে গঠিত করে অধিকতর গণতান্ত্রিক রূপ প্রদান করল। গণভোটের ব্যবস্থা দ্বারা আইনসভার উপর ভেটো প্রয়োগের ব্যবস্থাও ১৭৯৩-এর সংবিধানে ছিল। আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত দেশের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিদের এক তালিকা থেকে ২৪ জন ব্যক্তিকে নিয়ে শাসনবিভাগ গঠনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দেশে তখন "বিভীষিকার রাজত্ব" চালু থাকায় ১৭৯৩-এর নতুন সংবিধান কেবলমাত্র কাগজের স্তূপেই জমা হয়েছিল, কখনও কার্যকরী হয় নি। পরবর্তীকালে, ১৭৯৫ সালে ঐ কনভেনশন আর একটি নতুন সংবিধান চালু করে দেশে "ডাইরেক্টরী ব্যবস্থা"র প্রবর্তন করেছিল।

ডাইরেক্টরী শাসনে পাঁচজন ব্যক্তিমণ্ডলী শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এই পাঁচজনকে আইনসভার সদস্যগণের মধ্য থেকেই ঠিক করা হত। আইনসভা ছিল এই সময়ে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। কিন্তু ভোটাধিকারের মাপকাঠি ছিল সম্পত্তির মালিকানা। এই ডাইরেক্টরী শাসনও ব্যর্থ হল। কারণ তার সদস্যগণ ছিলেন অতি সাধারণ মেধাসম্পন্ন ও অন্তর্কলহে লিপ্ত। কনভেনশনের পরবর্তী অবস্থা তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে স্বভাবতই ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যর্থতার ফলে নৈরাশ্য সৃষ্টি হওয়ায় দেশ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। এই অবস্থায় ১৭৯৯ সালে ডাইরেক্টরী শাসনের পরিবর্তে 'কন্‌স্যুলেট'-এর শাসন চালু করা হল। 'কনস্যুলেট' ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা তিনজন কন্‌সালের উপর ন্যস্ত ছিল। এই তিনজন কন্‌সালের প্রধান ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

১৭৯৯ সালের 'কন্‌স্যুলেট' সংবিধান প্রথম কন্‌সালকে অন্যান্য দুজন কন্‌সাল-এর তুলনায় অধিক ক্ষমতা প্রদান করেছিল। বাস্তবিকপক্ষে, নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বে সেই অতিরিক্ততা এক অবাধ ক্ষমতার অধিকারী শাসক সৃষ্টি করেছিল। তিনি আইন প্রস্তাব করা, প্রশাসনিক উপদেষ্টা মনোনয়ন, মন্ত্রী নিয়োগ, দূত নিয়োগ, স্থল ও নৌ বাহিনীর অধিকর্তাগণকে নিয়োগ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অধিকর্তাদের নিয়োগ প্রভৃতি ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী ছিলেন। দ্বি-কক্ষ আইনসভার পরিবর্তে ১৭৯৯-এর কনস্যুলেট ব্যবস্থা ছিল চারভাগে বিভক্ত — (ক) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রস্তাবক সভা, (খ) ঐ প্রস্তাবগুলির প্রারম্ভিক আলোচনা-কক্ষ, (গ) ঐগুলিকে ভোট প্রদান নিমিত্ত আইন-কক্ষ, (ঘ) ঐগুলির সাংবিধানিক বৈধতা বিচারের নিমিত্ত সেনেটসভা।

১০৫.৩ প্রথম সাধারণতন্ত্রের পতন এবং ১৮০৪ সালে নেপোলিয়নের শাসন প্রতিষ্ঠা

কিন্তু যখন ১৮০২ সালে গণভোটের মাধ্যমে নেপোলিয়ন নিজেকে আজীবন কন্‌সাল নির্বাচিত করলেন তখন সমগ্র কন্‌স্যুলেটের শাসন বিলুপ্ত হয়। ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ন নিজেকে 'ফ্রান্সের সম্রাট' বলে ঘোষণা করেন। সম্রাট পদটি তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকারীর প্রতিষ্ঠান রূপে অধিষ্ঠিত করা মাত্র ফ্রান্সে প্রথম সাধারণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো ধ্বংস হয়।

নেপোলিয়ন তাঁর রাজত্বকালে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্র ধ্বংস করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর সময়ে ফরাসী বিপ্লবের ফেলে আসা গণতান্ত্রিক মানুষের প্রেরণাগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন তিনি বহু আইনের বিধিবদ্ধ সংস্কার করেছিলেন, আইন প্রণয়ন ও প্রযোগপদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে বিধিবদ্ধ করেছিলেন, গির্জা ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে তিনি নতুন রূপ দিয়েছিলেন। গোষ্ঠীগত সুযোগ সুবিধার বিলোপ করে তিনি 'Career open to the talents' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক রীতি ও কর্তব্য থেকে নেপোলিয়ন ফরাসী জনগণকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করেছিলেন এবং জাতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বিধিনিষেধ তুলে দিয়েছিলেন। বর্তমানের ফরাসী শাসনব্যবস্থার সামাজিক আইন ও বিচারপদ্ধতির ভিত্তি নেপোলিয়নের উপরিউক্ত কার্যাবলীর মধ্যেই নিহিত আছে।

১০৫.৪ নেপোলিয়নের পতন—জুলাই বিপ্লব-ফেব্রুয়ারি বিপ্লব

নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সে পুনরায় লুই রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সম্রাটপদে অভিষিক্ত হলেন। তিনি ইংল্যান্ডের ধাঁচে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এর ফলে ১৮১৪ সালের "সাংবিধানিক সনদ"-এর বিধিনিয়ম চালু হল। কিন্তু শেষপর্যন্ত অষ্টাদশ লুই তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনের কোন চেষ্টা করেন নি। তাঁর ভাই দশম চার্লস ১৮২৪ সালে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ফ্রান্সের সম্রাট হয়ে ১৮১৪ সালের "সংবিধানের সনদ"-এর কিছু নিয়মকানুন ভঙ্গ করেছিলেন। এই অবস্থায় লুইতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৮৩০ সালে "জুলাই বিপ্লব" সংঘটিত হল। দশম চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এই রকম অচলাবস্থায় ফ্রান্স আর একবার নতুন সরকার প্রবর্তনের সমস্যায় পড়ল।

অর্লিয়নে বংশের লুই ফিলিপকে এই সময়ে কেবলমাত্র সাংবিধানিক শাসকরূপে অভিষিক্ত করা হল। নিয়মতান্ত্রিক কায়দায় শাসন করবার জন্য তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু রাজতন্ত্রের অসহায়তা ও রাজদলীয় ব্যবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সংসদীয় ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রচলন তাঁর সময় অসম্ভব হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত লুই ফিলিপীয় ব্যবস্থা জনসাধারণের সমর্থন হারাল এবং ফ্রান্সের জনসাধারণও রাজতন্ত্র হতে সাধারণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকতে লাগল। ফলে ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালে "ফেব্রুয়ারি বিপ্লব" দেখা দিল। লুই ফিলিপ সিংহাসন ত্যাগ করে দেশত্যাগ করলেন। এই সময়ে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে ফ্রান্স নিজেকে সাধারণতান্ত্রিক বলে ঘোষণা করল। এই সাধারণতন্ত্র ফ্রান্সের "দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র" (১৮৪৮-১৮৫২) নামে পরিচিত।

১০৫.৫ দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র

আমেরিকার রাষ্ট্রপতিশাসিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর ধাঁচে দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র গঠন করা হয়েছিল। একটি স্বাধীন সরকারের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রে গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে জনসাধারণ দ্বারা চার বছরের জন্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির উপর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছিল। চার বছর পরে ঐ ব্যক্তি পুনরায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থী হতে পারতেন। মোটামুটিভাবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত আইনসভাটি ছিল এক-কক্ষবিশিষ্ট। ফ্রান্সের জনসাধারণের কাছে এই ব্যবস্থাও মনঃপূত হল না। জাতীয়সভা বা পার্লামেন্ট নির্বাচিত হবার পর এর দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সদস্য রাজতন্ত্রের সমর্থক হলেন। ফলে ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে ফরাসী জনসাধারণ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়নকে দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করেন।

লুই নেপোলিয়ন নিজে ব্যক্তিগতভাবে সাধারণতন্ত্রের বিশ্বাস করতেন না। তিন বছর রাষ্ট্রপতি থেকে তিনি তাঁর বংশগত ঐতিহ্যে এক "শাসনতান্ত্রিক অভ্যুত্থান' ঘটালেন। এই অভ্যুত্থানের দ্বারা তিনি সংবিধান সংশোধিত করে নেপোলিয়নের ন্যায় নিজের পদের মেয়াদকে দশ বছর বৃদ্ধি করলেন। সেই মুহূর্তে সমস্ত ফরাসী জাতি দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের আসন্ন পতন মনে মনে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৫২ সালের ৭ই নভেম্বর সেনেটসভা সম্রাটীয় শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঘোষণা করে। এই ঘোষণা জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা হলে জনসাধারণ সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। এইভাবে দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র দ্বিতীয় সম্রাটতন্ত্রে পর্যবসিত হয়ে তৃতীয় নেপোলিয়নকে শাসকপদে

প্রতিষ্ঠিত করে। কার্টার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, যে কোন বলিষ্ঠ-ব্যক্তিত্বের জনপ্রিয় নেতাই যে সাধারণতন্ত্রের পরিপন্থী—এই সত্য ফরাসী জনসাধারণ অভিজ্ঞতায় অর্জন করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয়েছিল যে, রাজা হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমন্বিত কোনও নেতাকে বাধা দেবার সামর্থও ফরাসী জনসাধারণের তখন ছিল না।

তৃতীয় নেপোলিয়ন দুই কক্ষ আইসভার পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। সমাজের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের নিয়ে সেনেট গঠন করেছিলেন। তাঁরা সম্রাটের দ্বারা মনোনীত হয়ে আজীবন সেনেটের সদস্য ছিলেন। কিন্তু নিম্নকক্ষ বা অ্যাসেম্বলির সদস্যগণ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হতেন, যদিও নিম্নকক্ষ কোনদিনই জনমতের সার্থক প্রতিবিম্ব হয়ে উঠতে পারে নি। তাঁর রাজত্ব প্রায় দশ বছর ভালোই চলেছিল। নানান সামাজিক ও শিল্প আইন চালু হওয়ার ফলে জন-অসন্তোষ কিছুটা কমেছিল কিন্তু সেই সঙ্গে সম্রাটের জনপ্রিয়তাও হ্রাস পেয়েছিল। অবস্থা বেগতিক অনুমান করে সম্রাট বেশ কিছু সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই সমস্ত সংস্কার মূলতঃ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও জনতার সরকার কায়েম করার দিকেই লক্ষ্য নিবিষ্ট করেছিল। সভাসমিতি ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। ১৮৭০ সালের ২১শে মে, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের এক নতুন সংবিধান "অ্যাক্ট এ্যাডিসনেল" নামে রচিত হয়েছিল। এতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইনসভা ও সম্রাট প্রত্যেকের হাতেই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু জুলাই মাসে সম্রাট প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক হঠকারী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পরাজিত হলেন ও দেশত্যাগ করলেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ "সেডানের যুদ্ধ" নামে খ্যাত।

তৃতীয় নেপোলিয়নের দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার সম্রাটতন্ত্রের অবসান ঘটল। সম্রাটের সময়কার আইনসভার একজন গোঁড়া সাধারণতন্ত্রী গ্যাম্বেটের নেতৃত্বে ১৮৭০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর "জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার" স্থাপিত হল। সেডানের যুদ্ধবিরতিকালীন অবস্থার মধ্যে এই সরকার 'যুদ্ধ বা শান্তি' এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একটি নিয়মিত জনপ্রতিনিধিসভা নির্বাচনের আদেশ জারি করল। সেই অনুসারে ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭১ সালের নির্বাচনের পর ৬৩০টি আসনের মধ্যে ৪০০টি আসন রাজতন্ত্রীরা দখল করেছিল। এই রাজতন্ত্রীগণ আবার বুরবঁ বংশীয় ও অর্লিয়নে বংশীয় — এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই অবস্থায় ফ্রান্সের আইনসভা ফরাসী সাধারণতন্ত্রের শাসকপ্রধানরূপে এড্লফ্ থিয়ের-কে মনোনীত করল। থিয়ের-এর নেতৃত্বে সেডানের শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলে জাতীয়সভা আগামীদিনের ফ্রান্সের সরকার গঠনে উদ্যোগী হয়েছিল।

এই জাতীয় সভার গঠনতন্ত্র সমগ্র দেশের বিশেষত প্যারিসের বিপ্লবীদের মনঃপূত ছিল না। কয়েকজন সাধারণতন্ত্রীর মতে ঐ জাতীয়সভা গঠিত হয়েছিল কেবলমাত্র সেডানের যুদ্ধের পর শান্তিচুক্তি মীমাংসার জন্য। তাই সংবিধান রচনার কোন অধিকার ঐ জাতীয়সভার ছিল না। জাতীয়সভা এই আপত্তিকে গ্রাহ্য না করে সংবিধান রচনা করবার জন্য একটি "খসড়া কমিটি" নিয়োগ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে খসড়া কমিটির পরবর্তী সময়ে নির্বাচনে জাতীয়সভার ১১০টি আসনের মধ্যে ১০০টি সাধারণতন্ত্রীরা দখল করে। সাধারণতন্ত্রীদের এই বিজয় ও রাজতন্ত্রীদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ১৮৭১ সালে রিভেট আইন পাশ হয়। এই আইনে তিয়েবকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়। এই ব্যবস্থাও ছিল অস্থায়ী সরকারী ব্যবস্থা মাত্র। ১৮৭৩ সালে জাতীয়সভা তিয়েরের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানায়। মার্শাল ম্যাক্মহন নামে একজন বিখ্যাত রাজতন্ত্রী সৈনিক রাষ্ট্রপতি হন। সেনেটের আই দ্বারা ম্যাক্মহনকে সাত বৎসর রাষ্ট্রপতি রূপে কাজ করতে বলা হয়। ১৮৭৫ সালে মাত্র এক ভোটের আধিক্যে ওয়ালটন্ সংশোধনী গৃহীত হয়। এই সংশোধনী আইনে বলা হয় যে, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি প্রতি সাত বৎসর অন্তর নির্বাচিত হবেন। এই বছরই ফেব্রুয়ারি মাসে (১) সেনেটের গঠন সম্পর্কে এবং (২) প্রশাসন ক্ষমতার কাঠামো সম্পর্কে আইন প্রণীত হয়। জুলাই মাসে সেনেটরদের নির্বাচনপদ্ধতি সম্পর্কে ও আগস্ট মাসে প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে আইন পাশ হয়। এই আইনগুলি বাস্তবিকপক্ষে ফ্রান্সের "তৃতীয় সাধারণ তন্ত্রের" ভিত্তি স্থাপন করে।

প্যারী কমিউন

এই সময় ফ্রান্সে ঐতিহাসিক বিপ্লবী "প্যারী কমিউন" গঠিত হয়। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ফ্রান্সে কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এই সরকার "প্যারী কমিউন" নামে পরিচিত। প্যারী কমিউনের সময় কমিউনিজমের স্রষ্টা ও প্রবর্তক কার্ল মার্ক্স জীবিত ছিলেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে নানা কারণে এই প্যারী কমিউনের পতন ঘটে। প্যারী কমিউনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কার্ল মার্ক্সের বিভিন্ন রচনা ও পত্রবলী রয়েছে। প্যারী কমিউনের থেকে মার্ক্সসের সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সেডানের যুদ্ধের সময় (১৮৭০-৭১ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্যারী নগরীর শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষ নিজেরাই গঠন করেছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনী। প্যারিস রক্ষা করবার জন্য শ্রমিক শ্রেণী নিজেরাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলে তিয়েরের (Adorhe Their) নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, জনগণের এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মুখে তিয়েরের সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ প্যারিসে রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণী দখল করে নেয়। তারফলে জন্মলাভ করেছিল প্যারী কমিউন। ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ প্রত্যুষে ঘোষিত হয় Viva la Commune অর্থাৎ "কমিউন দীর্ঘজীবী হউক"। ১৮ই মার্চ এক ইস্তাহারে শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেছিল, 'প্যারিসের প্রলেতারিয়েতেরা শাসক শ্রেণীর ব্যর্থতা ও দেশদ্রোহিতা থেকে এ কথাই উপলব্ধি করেছে যে, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে আপন ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠা যে তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং পরম অধিকার একথা তারা অনুভব করেছে। পরিস্থিতি রক্ষা করার মুহূর্তটি আজ সমাগত .... সরকারী ক্ষমতা দখল করে।

১৮ই মার্চ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে কমিউনের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করে যে, কমিউনই হবে সেই সংস্থা যার কাছে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। তাই সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কমিউনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কমিউন গঠিত হয়েছিল নগরের বিভিন্ন অংশের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটি গুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে। এই প্রতিনিধিরা দায়ী ছিলেন নির্বাচকদের নিকট এবং নির্বাচকরা যে কোনো সময়ে শাসন-প্রতিনিধিবর্গকে প্রত্যাহার করবার ক্ষমতার (পদচ্যুতি বা Recall) অধিকারী ছিল।

মার্কসের রচনা, থেকে উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, সরলতম ধারণায় কমিউনের অর্থ হল শ্রমিকশ্রেণীর সরকার। কমিউন পার্লামেন্টারী সংস্থা ছিল না, ছিল কাজের সংস্থা — একাধারে কার্যনির্বাহক ও আইনী সংস্থা।

প্যারী কমিউনের কৃতিত্বের মধ্যে ছিল —

১. স্থায়ী ফৌজের বিলোপ সাধন ও জনসাধারণের সশস্ত্র বাহিনী গঠন।

২. পুলিশকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতিয়ারের পরিবর্তে কমিউনের সেবকে পরিণত করা। এই পুলিশ ছিল কমিউন কর্তৃক নিযুক্ত ও প্রত্যাহারযোগ্য। পুলিশের বেতন ছিল শ্রমজীবী মজুরের বেতনের সমান।

৩. বিচারপতিরাও ছিলেন নির্বাচিত, প্রত্যাহারযোগ্য ও দায়িত্বশীল।

৪. সমাজের সমস্ত বিষয়ে উদ্যোগ ছিল কমিউনের হাতে।

৫. সরকারি কাজকর্মে সমাজের উর্ধ্বে উঠে সম্পন্ন হত না, তা সম্পন্ন হত শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন কমিউন দ্বারা।

৬. কেন্দ্রীয় সরকারের পেটোয়াদের উপর ন্যস্ত ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন।

৭. গির্জা ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ।

৮. শিক্ষাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত ও অবৈতনিক করা।

৯. রুটি তৈরির কারখানায় রাতের কাজ বন্ধ করা।

১০. কারখানায় কারখানায় জরিমানা প্রথা রহিত।

১১. গরিবদের বকেয়া খাজনা মকুব।

১২. বন্ধ কারখানা খোলা এবং সেগুলি পরিচালনার দায়িত্ব শ্রমিকদের সংস্থার উপর অর্পণ।

১৩. কমিউনের সদস্য থেকে অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত জনসাধারণের দ্বারা নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীর ছিল সমান মজুরি — এবং তা ছিল একজন শ্রমজীবী মানুষের মজুরির সমান।

১৪. বিজ্ঞানকে সকলের অধিগম্য করা।

১৫. কুসংস্কারের বন্ধন থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্ত করা।

১৬. কমিউন দ্বারা পৌরকর নির্ধারণ ও সংগ্রহ।

১৭. কর সংগৃহীত হত সাধারণ রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।

১৮. কর-সংগৃহীত অর্থ বিলি হত সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য এবং বিলিব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন কমিউন নিজে।

১৯. সরকারি নিপীড়নের শক্তি, যা ছিল সমাজের উপর কর্তৃত্ব - তা ভেঙে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি সংস্থার সরকার প্রবর্তন।

২০. ধর্ম ও শিক্ষার পৃথকীকরণ।

প্যারী কমিউনের পতনের কারণ হিসেবে মার্ক্স উল্লেখ করেছেন যে, কমিউনের ভুলের জন্য প্যারী কমিউনের সাফল্যের ফল জনসাধারণ বেশিদিন ভোগ করতে পারে নি। প্যারী কমিউনের ভুলগুলি ছিল —

১. "উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ কর" — এই সংকল্প নিয়ে কমিউন অগ্রসর হয় নি।

২. ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স প্যারী কমিউনের হস্তগত হলেও প্রচুর অর্থ কমিউন বাজেয়াপ্ত করে নি এবং বুর্জোয়াদের এই ধন-সম্পত্তিকে কমিউন সযত্নে রক্ষা করেছিল।

৩. পলাতক বুর্জোয়াদের সম্পত্তি দখল না করা।

৪. রেল কোম্পানীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করা।

৫. ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্যে পাতি বুর্জোয়াসুলভ শ্রদ্ধা আর "সকলের ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার করার স্পৃহা" - এই অদ্ভুত ধরনের মনোভাব কমিউনের মধ্যে থাকা।

৬. শত্রুদের প্রতি প্যারী কমিউনের অত্যধিক মহানুভবতা প্রদর্শন।

৭. শত্রুদের ধ্বংস করার পরিবর্তে তাদের উপর কমিউন নৈতিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা।

৮. গৃহযুদ্ধে সামরিক কার্যকলাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারা।

৯. ১৮ই মার্চ তারিখেই ভার্সাই অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করার ক্ষেত্রে দ্বিধা অবলম্বন এবং তার ফলে ভার্সাই অধিষ্ঠিত বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে সংগঠিত করার ও মে মাসের রক্তাক্ত অভিযান তিয়েরের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া।

১০. ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কমিউন কর্তৃক সক্ষম না হওয়া।

১১. কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে ব্যর্থ হওয়া।

১২. শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব কোনও পার্টি না থাকা।

প্যারী কমিউনের নেতৃস্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠরা ছিলেন প্রুঁধোপন্থী। এঁরা কমিউন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কৃষকদেরকে নিরপেক্ষ থাকতে বলেছিলেন এবং কৃষকদের উদ্দেশ্যে এও বলেছিলেন যে, এই বিপ্লব (প্যারী কমিউন প্রতিষ্ঠা) থেকে কৃষকেরা কিছুরই যেন আশা না করে, কারণ এই বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল শ্রমিকদের স্বার্থে। এইভাবে প্যারী কমিউন প্রতিষ্ঠা থেকে ফ্রান্সের জনসাধারণের সর্ববৃহৎ অংশ বিচ্ছিন্ন থাকায় প্যারী কমিউন স্থায়ী হতে পারে নি। বরং বলা যায় শুরু হতেই মিত্রহীন হয়ে শ্রমিকশ্রেণী ছিল বিচ্ছিন্ন। সমাজের মূল অংশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপ্লবী প্যারী কমিউন দ্রুত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কোন বিপ্লবী সামাজিক পরিবর্তন অদ্যাবধি সমাজের কৃষকশ্রেণীর সমর্থন ব্যতীত সাফল্য লাভ করেছে এমন উদাহরণ মানব ইতিহাসে নেই। সুতরাং ইতিহাসের বাইরে গিয়ে এবং মার্ক্সের কথায় কর্ণপাত না করে প্যারী কমিউনের নেতৃবৃন্দ ভুল করেছিলেন। তার ফলেই এবং তিয়েরের মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তাক্ত অত্যাচারের ফলেই প্যারী কমিউনের পতন ঘটেছিল।

লেনিন প্যারী কমিউনের অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কাউটস্কি, বার্নস্টিন প্রমুখ সংশোধনকারীদের বিরুদ্ধে তিনি প্যারী কমিউনের শিক্ষার যুক্তি অবতারণা করে সর্বহারার একনায়কত্ব এবং 'সর্বহারা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠাকে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের প্রকৃত মার্ক্সীয় পন্থা বলে "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছিলেন।

১০৫.৬ তৃতীয় সাধারণতন্ত্র

১৮৭৫ সালে প্রচলিত তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল যে ইহা চতুর্থ সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের পূর্বসূরী। তৃতীয় সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সাত বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন এবং পুনর্নির্বাচনেও প্রার্থী হবার অধিকারী ছিলেন। শাসকপ্রধান হিসাবে সমস্ত চিরাচরিত ক্ষমতা—যথা ক্ষমা প্রদর্শন, সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব, আইন প্রস্তাব করা, উচ্চপদস্থ সামরিক, প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রভৃতি ক্ষমতা তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির ছিল। তিনি জনপ্রতিনিধি সভাকে ভেঙে দেবার ক্ষমতাও রাখতেন। তবে এই ক্ষমতা, ১৮৭৭ সালে ম্যাকমহন (Marshal MacMohan) যখন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন ছাড়া আর কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। এত ক্ষমতা সত্ত্বেও তৃতীয়

সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি ছিলেন নামমাত্র শাসক। প্রকৃত শাসক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অ াপক প্রাইসের ভাষায় বলা যায়, "He was constitutionally irresponsible and therefore no document signed by him was valid unless it was countersigned by a minister who could be held responsible in Parliament for the contents of the document. The head of government was the President of the Council of Ministers."

তৃতীয় সাধারণতন্ত্র আইনসভা ছিল দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সেনেট (senate) ও জনপ্রতিনিধি সভা (Chamber of Deputies)। বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা গঠিত এক বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা পরোক্ষ পদ্ধতিতে সেনেটের ৩০০ জন সদস্য নির্বাচিত হতেন। প্রতিটি সদস্যের কার্যকাল ছিল নয় বছর। তাঁদের ন্যূনতম ৪০ বছর বয়স্ক হওয়া আবশ্যিক ছিল। মোট ৩০০ সেনেট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ প্রতি তিন বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করতেন। সেনেট সদস্যগণ বিল প্রস্তাব করতে পারতেন। জনপ্রতিনিধিসভা কর্তৃক প্রেরিত বিলগুলিকে তাঁরা অনুমোদন করতে বাধ্য থাকতেন। আর্থিক ব্যাপারে সেনেটের প্রায় কোন ক্ষমতাই ছিল না। তাছাড়া সেনেট রাষ্ট্রপতিকে এবং মন্ত্রিগণকে অভিযুক্ত (Impeachment) করার অধিকারী ছিল।

জনপ্রতিনিধিসভার সদস্যরা সর্ব সাধারণের (স্ত্রীলোক ছাড়া) ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হতেন মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৬১৫। এর মেয়াদ ছিল চার বছর। রাষ্ট্রপতি এই সভাকে ভেঙে দেওয়ার অধিকারী ছিলেন কিন্তু ম্যাকমহনের সময়ে ঐ একবার ছাড়া রাষ্ট্রপতি কখনও প্রতিনিধিসভা ভাঙেন নি। প্রতিনিধিসভা ও সেনেটের মধ্যে দ্বন্দ্ব কিভাবে মীমাংসা করা যায়, তার কোন উল্লেখ তৃতীয় সাধারণতন্ত্রে ছিল না। এই ধরনের ঘটনা সাধারণত ঘটত না, ঘটলেও স্বল্পায়ু মন্ত্রিসভার উত্থান-পতনের মধ্যে সেনেট নিজের ভূমিকাকে শক্তিশালী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। এই সেনেটের গঠন-প্রকৃতি ছিল রক্ষণশীল। সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা তাই সেনেটের উচ্ছেদ দাবি করেছিল।

তৃতীয় সাধারণতন্ত্রে মন্ত্রিসভার ক্ষমতা যেমন ব্যাপক ছিল, তেমনই ছিল তার অসহায়তা। বিভিন্ন আইনের ফাঁক মন্ত্রিসভা পূরণ করত এবং স্থানীয় শাসন ছিল পুরোপুরি মন্ত্রিদের নিজস্ব বিভাগগুলির হাতে। কিন্তু মন্ত্রিসভ দুর্বল হওয়ায় এবং মেয়াদকাল অনিশ্চিত হওয়ায় মন্ত্রিসভা ছিল অসহায়। তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের ৬৫ বছরে ১০০ বার মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের পতন পর্যন্ত প্রতিটি সরকারের গড় মেয়াদ ছিল প্রায় ৬ মাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থায় তৃতীয় সাধারণতন্ত্র টিকে থাকতে পারল না। পল রেন পদত্যাগ করবার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক নায়ক মার্শাল পেঁতা (Marshal Petain) ক্ষমতায় এলেন। এই সময় ফ্রান্স "অধিকৃত" ও "অনধিকৃত" এই দুই এলাকায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভিচিতে স্থাপিত ফরাসী সরকার নিজেকে অনধিকৃত এলাকার সরকার বলে ঘোষণা করলেও বিদেশী প্রভাব থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না।

১০৫.৭ অস্থায়ী সরকার

জাতীয়সভা যুগ্ম অধিবেশনে মার্শাল পেঁতার সরকারকে নাগরিকগণের কাজ, পরিবারের ও দেশবাসীর অধিকার সংবলিত রচনার দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু পেঁতা কখনই নতুন সংবিধান চালু করেন নি। সর্বপ্রকারের ক্ষমতা পাওয়ার পর তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান বলে ঘোষণা করলেন। মন্ত্রি নিয়োগ ও অপসারণ কেবল তাঁর নিজের ইচ্ছানুসারে হবে — এই আদেশও জারী করলেন। মন্ত্রিসভাকে কেবল তাঁর নিকটই দায়িত্বশীল রাখলেন। মোটামুটিভাবে বিভিন্ন

নিয়মকানুন ও আদেশের দ্বারা পেঁতার একনায়ক স্থাপিত হয়েছিল। ভিচি নামক স্থানে পেঁতার একনায়কত্বে তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের পতন ঘটল। এই পেঁতার শাসনকালে অর্ন্তবর্তী "ভিচি শাসন" নামে ইতিহাসে পরিচিত।

ভিচিরাজত্ব ও ফ্রান্স দখলের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধও এক ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনা। এই প্রতিরোধ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও বিক্ষিপ্ত। কিন্তু মিত্রবাহিনী উত্তর আফ্রিকাতে উপস্থিত হওয়ার পর প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত রূপ নেয়। ১৯৪৩ সালে একটি জাতীয় প্রতিরোধ সমিতি গঠিত হয় ও 'বিদেশে সরকার' নামে দ্য গলের নেতৃত্বে একটি সরকার লন্ডনে গঠিত হয়। মিত্রশক্তির দ্বারা ফ্রান্স মুক্ত হলে ১৯৪৪ সালে আগষ্ট মাসে দ্য গল প্যারিসে এসে ২০ জন কমিশনার বিশিষ্ট একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন (১৯৪৪-৪৫) ঐ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি স্বয়ং। এই দ্য গল সরকার প্রায় একনায়কতান্ত্রিক ধাঁচে গঠিত ছিল। এই শাসনকে Dictatorship by Consent বলা হয়। কিন্তু ফ্রান্সের সাধারণতান্ত্রিক রূপ বজায় রাখবার জন্য দ্য গল ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে নির্বাচন ঘোষণা করে গণপরিষদ সভায় গণভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বলেছিলেন।

১০৫.৮ প্রথম ও দ্বিতীয় সংবিধান সভা

এই গণভোটে ফরাসী জনগণের মনে এক নতুন সংবিধানের প্রত্যাশা বিপুলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ইঙ্গ-মার্কিন ধরনের একটি শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজনীয়তা এই নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছিল। নতুন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত হতে না হতেই দ্য গল ও বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধের ফলে দ্য গল হঠাৎ পদত্যাগ করলে সমাজতন্ত্রী দলের নেতা গুঁই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটি তাঁদের নতুন সংবিধানের রূপরেখায় এক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। এই প্রস্তাবে ভোটাধিকারের দ্বারা নির্বাচিত ৫ বছরের জন্য এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার কথা বলা হয়েছিল। যাই হোক, নতুন সংবিধানের এই প্রস্তাব গণভোটে বাতিল হয়ে যায়। কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা সমর্থন করা সত্ত্বেও ক্যাথলিক ও হঠকারী বামপন্থীদের বিরোধিতায় (মূলতঃ দ্বিকক্ষ আইনসভার প্রস্তাব না থাকার জন্যই) এই খসড়া প্রস্তাব গণভোটে বাতিল হয়। ফলে, দ্বিতীয়বার গণপরিষদ নির্বাচিত হয় ১৯৪৬ সালে জুন মাসে। এই নির্বাচনে গণপরিষদে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের শক্তি মোটামুটি আগের মত থাকলেও ক্যাথলিকদের শক্তি অল্প বৃদ্ধি পায়। এই গণপরিষদ সংবিধানের যে প্রস্তাবটি গণভোটে অক্টোবর মাসে দেয়, তা বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দেশের জনগণের মাত্র ৩৫ শতাংশ ঐ গণভোটে অংশগ্রহণ করেছিল। অধিকাংশ জনসাধারণ এই দ্বিতীয় গণপরিষদের সংবিধানেও তেমন নতুন কিছু না দেখে নিজেরা নির্লিপ্ত ছিল। যাই হোক, ফ্রান্সের এই নতুন সংবিধান চতুর্থ সাধারণতন্ত্র নামে পরিচিত (১৯৪৬-১৯৫৮)।

১০৫.৯ চতুর্থ সাধারণতন্ত্র

চতুর্থ সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান চূড়ান্ত বিচারে তৃতীয় সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের অনুরূপ ছিল। ফরাসী ইতিহাসে চতুর্থ সাধারণতন্ত্র ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সংবিধান। প্রাইসের ভাষায় "This constitution .... was the longest constitutional document in French history comprising 106 articles." এই সংবিধান প্রথম নারী ও পুরুষের সমানাধিকার স্বীকার করে। পার্লামেন্ট ছিল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট যথা — Council of Republic এবং National Assembly. এখানে উল্লেখ্য যে, দুটি কক্ষ সমান ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল না। রাষ্ট্রপতি সাত বছরের জন্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

কিন্তু মূলত ক্ষমতা ভোগ করতেন মন্ত্রিসভার প্রধান। আইনসভা ও সরকারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইনসভার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক মাত্রায় ছিল। তৃতীয় সাধারণতন্ত্রেও তাই থাকল। বহু সরকারের উত্থান-পতনে চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের ১২ বছরে ২০টি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৭ মাসে একটি করে মন্ত্রিসভা ছিল। এর কারণ ছিল প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয়সভার মধ্যে জটিল সম্পর্ক। এই সম্পর্কের ক্ষেত্রটি তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের পার্থক্যের অন্যতম একটি বিষয়। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সম্পর্কের বিষয়টি 'ইনভেস্টিচার' নামে পরিচিত। এই 'ইনভেস্টিচার' ১৯৫৪ সালে নভেম্বর মাসে সংবিধান সংশোধন দ্বারা বিলুপ্ত করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের যে প্রথা ছিল তা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী জাতীয়সভার কাছে আস্থার জন্য উপস্থিত হলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন — এই প্রথাই অনুসৃত হয়।

চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের পতন

জাতীয়সভা তার সমস্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছয় মাসের জন্য জেনারেল দ্য গলের হাতে অর্পণ করবার পর থেকে বস্তুত চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের পতন শুরু হয়। ১৯৫৮ সালের ১লা জুন চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সম্পূর্ণ পতন ঘটে। দ্য গল ছয় মাসের মধ্যে দেশের অবস্থা আয়ত্তে আনবেন এই প্রতিশ্রুতি দান করেন। এই সময় সংবিধান প্রণয়ন দ্য গলের প্রধানতম কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্য গল একনায়কের মতোই তাঁর সমস্ত কাজকর্ম করেছিলেন। ফ্রান্সের সমস্যা ছিল স্থায়ী সরকারের অভাব। সেই দৃষ্টিকোণ হতে দ্য গল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফ্রান্সে বজায় রাখতে চাইলেও আইনবিভাগের উপর শাসনবিভাগের নির্ভরশীলতা হ্রাস করে ন্যূনতম পর্যায়ে আনার পক্ষপাতী ছিলেন। আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা দ্য গলের খুবই পছন্দসই ছিল। ১৯৫৮ সালের ৩রা জুনের আইনে জাতীয় সভা তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দ্য গল সরকারকে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের পটভূমি গড়ে উঠে। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের খসড়া মাইকেল দেব্রের নেতৃত্বে গঠিত একটি ক্ষুদ্র ক্যাবিনেট কমিটি কর্তৃক রচিত হয়। দ্য গল নিজে এই খসড়া কমিটিতে ছিলেন না। তবে নতুন সংবিধানের রূপরেখা কি হবে, তা তিনি কমিটির সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দুই মাসের মধ্যে মন্ত্রিসভার ঐ কমিটি খসড়া তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করেন। ১৯৫৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ঐ খসড়া প্রস্তাব গণভোটে দেওয়া হলে সারা ফ্রান্স দ্য গলের প্রতি এক অভাবনীয় সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং নতুন সংবিধানের প্রস্তাব বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন লাভ করে।

ডরোথি পিকল্‌স্ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে 'বৈপ্লবিক উত্তরণ' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, "All there happenings and conflicts of opinion help to explain why, once again, Frenchmen were divided from the start in their attitudes towards a new regime. Their attitudes towards the constitution were coloured by their reactions to the revolution that brought it into being. The second President of the Fourth Republic, M. Coty, described it as a necessary and constructive revolution', as once that was effected in calm and in respect for the very law that had to be reformed. This was true of the actual transition from the Fourth to the Fifth Republic."

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এস. ই. ফাইনার মন্তব্য করেছেন, "the pendulum has swang from government assemblee to a highly personalist regime in a comparatively short span.

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর হতে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান কার্যকর হয়। জেনারেল দ্য গল ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পঞ্চম সাধারণ তন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং পঞ্চম সাধারণতন্ত্র সংবিধানের জনক মাইকেল দেব্রে হন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে, ফ্রান্সে বারবার বিপ্লব হয় এবং বিপ্লব ব্যর্থ হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মার্ক্স-এঙ্গেলসের রচনা উদ্ধৃত করা যায় — "১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক, স্থানীয়, শহুরে ও প্রাদেশিক সুযোগসুবিধার জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে দূর করার কাজের সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রণালীবদ্ধ ও সোপানতান্ত্রিক শ্রম বিভাজনের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি সর্বত্র বিরাজমান সংস্থাগুলি সহ এক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ শেষ প্রতিবন্ধকগুলিকে সামাজিক জমি থেকে সাফ না করে পারি না। ... পরবর্তী পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থাগুলির আমলে—রেস্টোরেশন, জুলাই রাজতন্ত্র ও শৃংখলা পার্টির প্রজাতন্ত্রের আমলে সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের চরম ব্যবস্থাপনা - তার পদ, ধনসম্পদ ও মুরুব্বিয়ানার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ শাসক শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলগুলির মধ্যে খেয়োখেয়ির বিষয় হয়ে দাঁড়াল ... প্রতিটি নতুন গণবিপ্লবের ফলে শাসক শ্রেণীগুলির একটা দল থেকে আরেকটা দলের কাছে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার ভার হস্তান্তরিত হওয়ার পরে, রাষ্ট্রক্ষমতার দমনমূলক চরিত্র আরও পূর্ণভাব বিকশিত হয় এবং আরও নির্দয়ভাবে তা ব্যবহৃত হয়। কারণ বিপ্লব যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলি যেন সুনিশ্চিত এমন আশ্বাস দিয়েছিল, সেগুলিকে ভাঙ্গা যায় কেবল বলপ্রয়োগ করেই। ...

তাছাড়া একের পর এক বিপ্লব যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তা শুধু রাজনৈতিকভাবে অনুমোদন করেছিল সামাজিক বাস্তব ঘটনাকে পুঁজির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে এবং সেই রাষ্ট্রক্ষমতাকে আরও বেশি প্রত্যক্ষভাবে হস্তান্তরিত করেছিল শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ বিরোধীদের হাতে।

এইভাবে জুলাইয়ের বিপ্লব ভূস্বামীদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেছিল বড় বড় শিল্প মালিকদের (বড় বড় পুঁজিপতিদের) কাছে এবং ফেব্রুয়ারির বিপ্লব হস্তান্তরিত করেছিল শাসক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ উপদলগুলির কাছে- তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বৈরীভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল তাদের নিজেদের শ্রেণী - শাসনের শৃঙ্খলার জন্য "শৃঙ্খলা পার্টি" হিসেবে। পার্লামেন্টারী প্রজাতন্ত্রের আমলে রাষ্ট্রক্ষমতা অবশেষে হয়ে গেল গৃহযুদ্ধে স্বীকৃত হাতিয়ার। উপযোজক শ্রেণী সেই হাতিয়ার ধারণ করল উৎপাদক জনসাধারণের বিরুদ্ধে। .. তাই যখন গণ প্রতিরোধের সমস্ত উপাদান ভেঙে পড়ল তখন পার্লামেন্টারী প্রজাতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে পথ করে দিল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকে।

ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ইংল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডের মতো দীর্ঘ নয়। আমেরিকার শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের সময়ের সাথে ফ্রান্সের ক্রমবিকাশের সময়ের মিল থাকতে পারে। কিন্তু আমেরিকার শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় গৃহযুদ্ধের অধ্যায় ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন নেই। অন্যদিকে ফ্রান্সের দুশো বছরের বেশি ইতিহাসে বহু রদ-বদল ঘটেছে। সেই সমস্ত ঘটনাগুলি ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে অনেক রোমাঞ্চকর ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ করেছে। সমাজ পরিবর্তনে সাংবিধানিক ও অসাংবিধানিক নানা উপায়সমূহের কলাকৌশলগত প্রয়োগ এবং তার ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের চাইতে ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য।

ফ্রান্সের সংবিধান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান উভয়-এর পটভূমি সামাজিক বিপ্লব হলেও ফরাসী বিপ্লব ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে চরিত্রগত মৌলিক পার্থক্য ছিল। অক্টোবর বিপ্লব সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করেছিল। অন্যদিকে ফ্রান্সের বর্তমান সংবিধানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফ্রান্সে একচেটিয়া ধনকুবেরদের শাসনকে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় রূপদানের ফলে 'জনতা-নেতার' শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছে। এতে একদিকে একনায়কের মতো ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন জাতির নেতা, অন্যদিকে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহে জনতার প্রবাহ সংমিশ্রিত হওয়ার ফলে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র বস্তুত সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত গণতন্ত্রের এক মিশ্রিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফ্রান্সের মতো রাজনৈতিক সচেতন ও গতিশীল সমাজ ধনকুবেরদের শাসনকে নিজস্ব সংকটের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ রাখার সর্বাধুনিক

বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার রূপ হচ্ছে ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্র। সুতরাং ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রের উৎস বিপ্লবে শুরু হলেও উভয়দেশের শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘটছিল দুটি বিপরীতমুখী ধারায়।

তাই উভয় দেশের শাসনতন্ত্রের পরিণতিও হয়েছে ভিন্ন। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়েনে একদলীয় ব্যবস্থা চালু হয়েছিল এবং সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপিত হয়েছিল। তার ফলে সমাজতন্ত্র তৈরি হয়েছিল, কিন্তু গণতন্ত্র নির্বাসিত হয়েছিল। গণতন্ত্রের অভাবের সমস্যা শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রকে বিকৃত করে, দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র সুদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসসাধন ঘটে ১৯৯১ সালে। বিপ্লব একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এক-দলীয় ব্যবস্থার চাপে। বিপ্লবের ধারক ও বাহক হল জনসাধারণ। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবের ধারক ও বাহক ছিল কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত রাষ্ট্র। ফলে সোভিয়েত ইউনিযনের বিপ্লব একবার ঘটেই থেমে গিয়েছিল। ১৯৮৭ সালের পর 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রৈকা' 'দ্বিতীয় বিপ্লব' সংঘটিত করা মাত্র সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯ সালের পর ফরাসী দেশে এক-দলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে নি এবং সমাজতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত করে নি। ফরাসী বিপ্লব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল। সেই বিপ্লব চলেছিল নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায়। জনসাধারণ নিজেদের বিপ্লবী ভূমিকাকে কখনই স্তব্ধ করে রাখে নি। ফলে ফ্রান্সে ঘটেছে একের পর এক বিপ্লব। এক বিপ্লব ব্যর্থ হলেও তা পরবর্তী বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল। ফরাসী জনসমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্য, দার্শনিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি ফরাসী জনগণকেই বিপ্লবের বাহিনীতে পরিণত করেছিল। কোনও বিশেষ দল বা বিশেষ ব্যক্তি কখনই ফরাসী জনসমাজে (civil society) প্রাধান্য (hegemony) লাভ করে নি। সোভিয়েত ইউনিয়নে জনসমাজের (civil society) উপর ছিল রাষ্ট্রের প্রাধান্য (hegemony)। কিন্তু বিপ্লব পরবর্তী ফ্রান্সে রাষ্ট্রের (state) উপর ছিল জনসমাজের (civil society) প্রাধান্য (hegemony)। ফলে ফ্রান্সে দুশ বছর রাষ্ট্রের (state) পরিবর্তন ঘটলেও জনসমাজের প্রাধান্যের (hegemony of civil society) পরিবর্তন ঘটে নি। সেজন্য ফ্রান্সে সাধারণতান্ত্রিক কাঠামো নানা ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে রুশীয় ও দলীয় প্রাধান্যের ফলে সমাজতন্ত্র বিকৃত হয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সেই বিকৃত সমাজতন্ত্রের ধ্বংস হয়েছে। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত 'সাধারণতন্ত্র' বিবৃত হয়েছিল, কিন্তু ফরাসী জনসাধারণ সেই বিকৃতিকে পরিবর্তন করবার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে বার বার বিপ্লব সংঘটিত করে 'সাধারণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তাই ফরাসী সাধারণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস হতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, যে বিপ্লবের উৎসে গণদেবতার জাগরণ থাকে, ফ্রান্সেই হোক আর রুশ দেশেই হোক, সেই বিপ্লবের ধারা কখনই শুকিয়ে যায় না, সময় ও পরিস্থিতিতে গতিপথ পরিবর্তন করে মাত্র। ফ্রান্সের সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নানা পথ পরিক্রমায় পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি জ্যাক সিরাকের আমলে এক গণতান্ত্রিক উদারনীতিবাদের চেহারা লাভ করেছে। সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্স ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন — উভয়ের উদ্ভব ভিন্ন, ব্যবস্থা ভিন্ন তাই পরিণতিও ভিন্ন। কিন্তু উভয় দেশের শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক সত্য এক — বিপ্লবের মৃত্যু নেই, বিপ্লবের জয় হবেই।

১০৫.১০ পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় আলজিরীয় যুদ্ধের অবসানের মধ্যেই পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরি হওয়ায় চার্লস দ্য গলের রক্ষণশীল চিন্তা এই সংবিধানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামো দুটি মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মূল বৈশিষ্ট্য দুটি হল : (১) অত্যধিক শক্তিশালী শাসনবিভাগের হাতে ফ্রান্সের রাষ্ট্র-কাঠামোর পুনর্গঠন এবং (২) পার্লামেন্টকে সীমিত রাজনৈতিক ও আইনগত ক্ষমতায় রাখা। এই দুটি শর্ত

সাপেক্ষেই দ্য গল ৪র্থ রিপাবলিকের পতনের পর ফরাসী দেশের ক্ষমতার হাল ধরতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। এই ভাবেই ফরাসী দেশে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত।

প্রস্তাবনা

এই মূল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রস্তাবনা ঘোষণা করা হয়েছে। মোট ৯২টি ধারা সংবলিত ঐ সংবিধানের প্রস্তাবনায় মানুষের "অধিকারের ঘোষণার সনদের" প্রতি ফ্রান্সের জনগণের অগাধ আস্থার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৭৮৯ সালের ঘোষণার জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে।

সম্প্রদায়

সংবিধানের ১নং ধারায় ফ্রান্সকে একটি Community বলা হয়েছে। এই ধারায় বলা আছে, "The Republic and the people of the overseas territorries, who, by an art of free determination, adopt the new constitution, institute a community. The community is founded on the equality and solidarity of the people composing it.

১নং ধারা ব্যতীত ৭৭-৮৭ নং ধারা সমূহেও ফ্রান্সকে সম্প্রদায় (Community) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ফরাসী সম্প্রদায়ভুক্ত (community) অঞ্চলসমূহ স্বয়ংশাসিত থেকে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভাবে নিজেদের শাসন পরিচালনা করে। ফরাসী সম্প্রদায় (community)-এর লোকেরা একই ধরনের নাগরিকত্ব ভোগ করে। সব ফরাসী নাগরিক ফরাসী আইনের চোখে সমান। আইনগত কর্তব্য পালনের বাধ্যবাধকতা প্রত্যেক ফরাসীকে সমানভাবে বহন করতে হয়। বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা, অর্থব্যবস্থা, দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কাঁচামাল সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্প্রদায় (community) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া সাধারণত বিচার ব্যবস্থা, উচ্চ-শিক্ষা, সাধারণ ও বিদেশীয় যোগাযোগ, পরিবহন, তার-যোগাযোগ ব্যাপারেও সম্প্রদায়ের (community) নিয়ন্ত্রণ থাকে।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি সমগ্র ফরাসী সম্প্রদায়ের (community) সভাপতিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্প্রদায়ের (community) কাজ পরিচালনার জন্য একটি কর্মপরিষদ, সেনেট ও সালিশী আদালত আছে। কমিউনিটিভুক্ত অঞ্চলগুলি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফরাসী কমিউনিটির রাষ্ট্রপতি হিসাবে কমিউনিটিভুক্ত প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। কমিউনিটিভুক্ত যে কোনও বহির্দেশীয় অঞ্চল ইচ্ছা করলে ৮৬ নং ধারানুযায়ী কমিউনিটি ত্যাগ করতে পারে।

কমিউনিটি ধারণা দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী উদারতা উপনিবেশগুলিকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে দ্য গল তাদের একসূত্রে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ধারণা তাঁর মাথায় ছিল। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। একে একে ফরাসী উপনিবেশগুলি তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। Metropolitan Finance সম্বন্ধে উপনিবেশগুলির কোন উৎসাহ ছিল না। কমিউনিটি সংক্রান্ত ধারাগুলি তাই আজ কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ।

সাধারণতন্ত্র

সংবিধানের ২নং ধারায়, "ফ্রান্স একটি সাধারণতান্ত্রিক, অবিভাজ্য, ধর্মনিরপেক্ষ, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক" — এই কথা বলা হয়েছে (France is an Indivisible, Secular, Democratic and Social Republic) এর দ্বারা

নাগরিকদের অধিকার ও সমস্ত প্রকার বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে। মার্সাই ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের লক্ষ হিসাবে স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীর কথা বলা হয়েছে।

গণসার্বভৌমত্ব

সংবিধানের ৩নং ধারা অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতার আধার হল জনগণ। এই সার্বভৌম ক্ষমতা কেবল জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মধ্যেই সীমিত থাকবে না, গণভোটের মাধ্যমেই সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার হবে। নির্বাচন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হলেও নির্বাচন সর্বদা সার্বজনীন, সমান ও গোপনভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

বহুদলীয় ব্যবস্থা

সংবিধানের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান শ্রদ্ধাশীল। এই কথা বলে রাজনৈতিক দলগুলিকে ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রতি শ্রদ্ধানুগ থাকতে বলা হয়েছে (Polical parties and groups may complete for the expression of the suffrage. They may freely form themselves and exercise their activities. They may respect the principles of national sovereignty and of democracy).

অনেকে মনে করেন যে, তদানীন্তনকালে শক্তিশালী ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিকে সংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আটক রাখাই ছিল ৪নং ধারার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

ফ্রান্সের রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থা নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফ্রান্সে জোট-রাজনীতি (coalitional politics) গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে জোটও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে আছে। ফরাসী রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় বহুদলীয় বা দ্বি-মেরুকরণ জোট প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থা চতুর্দলীয় বা পঞ্চদলীয় ব্যবস্থার রূপ লাভ করেছে। দ্য গলপন্থী দল, সমাজতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টি এবং মধ্যপন্থী দল ও গোষ্ঠীসমূহ ফ্রান্সের নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি ফ্রান্সে বহু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অবদান লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি

সংবিধানের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সংবিধানকে ঠিকভাবে পরিচালিত করা রাষ্ট্রপতির আবশ্যিক কর্তব্য। তিনি নিয়মিত সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা করবেন। তিনি দেশের স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং জাতীয় চুক্তি ও সন্ধির রক্ষক। রাষ্ট্রপতি জরুরি ক্ষমতার অধিকারী (১৬নং ধারা) আলজিরীয় যুদ্ধের গৌরবময় ব্যক্তিত্ব দ্য গল রাষ্ট্রপতি হিসেবে অনেক সময় সংবিধানের ধারার অতিরিক্ত ক্ষমতাও ভোগ করতেন। এ থেকে বলা যায় যে, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জনপ্রিয়তার স্রোতে তাল রেখে তাঁর নিজের ভূমিকা যথেচ্ছভাবে পালন করতে পারেন। ডরোথি পিকল্‌স্ একে রাষ্ট্রপতির "personal leadership" আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "This principle of a president whose role is positive, who though he does not govern does more than reign – was expressed in the 1958 constitution by means of a division of executive power between President and Prime Minister that was not precisly defined."

পার্লামেন্ট

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্ট দ্বিকবিশিষ্ট-জাতীয়সভা ও সেনেট। জাতীয়সভার প্রতিনিধি বা ডেপুটিগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন ও সেনেটের সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বে জাতীয়সভা গঠিত। ডেপুটিগণ পাঁচ বছরের জন্য ও সিনেটরগণ এক বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি তিন বছর অন্তর সেনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। তুলনামূলকভাবে সেনেটের ক্ষমতা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেনেট ও জাতীয়সভার মধ্যে পার্থক্য দূরীভূত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী উভয় কক্ষের সমান সংখ্যক প্রতিনিধির যুক্ত কমিটির অধিবেশন আহ্বান করেন।

সংসদের সীমিত ক্ষমতা

পঞ্চম সাধারণতন্ত্র একটি 'Rationalised' (সুসংহত) পার্লামেন্টের প্রবর্তন করে পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে সীমিত রেখেছে। এক বছরে মাত্র দুবার জাতীয় সভা ও সেনেটের অধিবেশন বসে। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে দেখা দেয়। পার্লামেন্টের আইন করার ক্ষমতা সংবিধানপ্রদত্ত এলাকাতেই সীমিত। সংবিধানের ৩৭নং ধারা অনুযায়ী, ঐ এলাকার বাইরে কোনো কিছু করার ক্ষমতা নিয়মকানুন প্রণয়নকর্তার হাতে অর্পিত অর্থাৎ শাসন বিভাগ সরকারের উপরই ন্যস্ত। এছাড়া পার্লামেন্ট শাসনবিভাগকে আইন করার ক্ষমতা delegate করতে পারে। তাই ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের ব্যাপারে পার্লামেন্টের ভূমিকা অপেক্ষা সরকারের ভূমিকাই ব্যাপক। অতীতে পার্লামেন্ট যেভাবে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল তাতে দেশে স্থায়ী সরকার না থাকার তিক্ত অভিজ্ঞতাই পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পার্লামেন্টকে দুর্বল এবং শাসনবিভাগকে শক্তিশালী করেছে। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary Government with Presidential Leadership) হচ্ছে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের শাসনতান্ত্রিক অভিনবত্ব (constitutional innovation)।

সংসদের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা

পার্লামেন্ট দুর্বল হলেও সরকার পার্লামেন্টের প্রতি দায়িত্বশীল। পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের — একজনের ভোটে পরাজিত হলে সরকারকে ক্ষমতা হতে পদচ্যুত করা হয়। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর যে বিশেষ ক্ষমতায় পার্লামেন্টকে বাতিল করা হয় তা ১৯৫৮ সালের পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে রাষ্ট্রপতি নিজের ব্যক্তিগত অভিরুচিতে ভোগ করে থাকেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এক বছরে পার্লামেন্টকে দুবার বাতিল করতে পারে না। এই বাতিল করার সময় রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সভাপতির সাথে আলোচনা করতে হয়। সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব পরাজিত হলে ঐ প্রস্তাব স্বাক্ষরকারীগণ একই অধিবেশনে দ্বিতীয়বার অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারেন না।

এইভাবে পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভার মধ্যে ভারসাম্য রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফ্রান্সের চিরাচরিত সংকট 'স্থায়ী সরকারের অভাব' মোকাবিলা করবার জন্য পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে ডরোথি পিকল্‌সের বক্তব্য হল যে, "The unity, cohesion and internal discipline of the French government must be held sacred, if national leadership is not to degenerate rapidly into incompetence and impotence.

গণভোট

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের অন্যতম নতুনত্ব হল যে, কোন কোন বিষয়ে গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত স্থির করতে পারেন। ১১ নং ধারা অনুযায়ী তিনটি বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে — প্রথমত, সরকারি সংগঠন, দ্বিতীয়ত, জাতির সাথে কোন চুক্তির ব্যাপারে, তৃতীয়ত, কোন সন্ধি সম্পাদনের ক্ষেত্রে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১১ নং ধারা অনুসারে গণভোটের ব্যবস্থা সংবিধানসম্মত নয়। এই প্রসঙ্গে ব্লন্ডেল ও গডফ্রে বলেন, "This article has led to the clearest cases of unconstitutional on the part of the President, both in spirit and letter.

কারণ, স্পষ্ট বর্ণনা না থাকার জন্য ইহা অনুমেয় যে, পার্লামেন্ট অনুমোদন করার পরই রাষ্ট্রপতি যে কোন বিষয় গণভোটে দিতে পারেন। কিন্তু এ যাবৎ যে কটি গণভোট হয়েছে, সমস্ত ক্ষেত্রেই পার্লামেন্টের অনুমোদন তো দূরের কথা, পার্লামেন্টকে এড়িয়ে রাষ্ট্রপতি নিজেই গণভোটের ব্যবস্থা করেছেন। সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে ১১নং ধারা প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গণভোট অনুষ্ঠান ঠিক সাংবিধানিক কাজ নয়। কারণ, ঐ গণভোট ৮৯ নং অনুযায়ী হওয়ার কথা, ১১নং ধারা অনুযায়ী নয়। কিন্তু দ্য গল এই ক্ষেত্রেও ১১নং ধারা অনুযায়ী নয়। কিন্তু দ্য গল এই ক্ষেত্রেও ১১নং ধারা ব্যবহার করেছিলেন।

সাংবিধানিক সভা

চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সাংবিধানিক কমিটির পরিবর্তে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সাংবিধানিক সভা চালু করা হয়। সংবিধানের ৫৬ নং ধারা হতে ৬৩ নং ধারাগুলিতে সাংবিধানিক সভা সংক্রান্ত ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে। এই সাংবিধানিক সভা নয় বছরের জন্য নয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক সদস্য প্রতি তিন বছর অন্তর সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করতে পারেন।

এই নয়জন ব্যতীত সমস্ত ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতিগণ এই সাংবিধানিক সভার সদস্য। সাংবিধানিক সভার সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত নই। ভোটাভুটিতে দুইদিকে সমান সংখ্যক ভোট হলে পরে তিনি ভোট প্রদান করেন। সাংবিধানিক সভা প্রধানত চার প্রকার কাজ সম্পাদন করে থাকে। প্রথমত, রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্টের নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারগুলি গণভোটের নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা দেখে ও ফলাফল ঘোষণা করে। দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের স্ট্যান্ডিং নির্দেশ ও আইন ব্যাপারে সাংবিধানিক সভা অবশ্যই সংবিধানসম্মত উপরে আলোচনা করে। তৃতীয়ত, জরুরি ক্ষমতার ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসারে সাংবিধানিক সভা রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে। চতুর্থত, সাধারণ বিলগুলি (সন্ধির বিল সহ) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সভাপতির নিকট বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রেরণের পূর্বে সাংবিধানিক সভার নিকট প্রেরণ করা হতে পারে। সাংবিধানিক সভা কোন বিলকে অসাংবিধানিক বললে সেই বিলটি আর আইন হতে পারে না।

এইভাবে সাংবিধানিক সভা আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। পার্লামেন্ট তার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে কিনা সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাংবিধানিক সভাই গ্রহণ করে এবং তা সকলের উপর বাধ্যতামূলক।

মার্কিন দেশের মতো বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review) কোন সুযোগ ফ্রান্সে নেই। সাংবিধানিক সভা যা কিছু করে থাকে তা কেবল সাংবিধানিক পর্যালোচনা মাত্র।

রাষ্ট্রীয় সভা

রাষ্ট্রের প্রশাসনে সর্বোচ্চ তদারকি সংস্থা হল রাষ্ট্রীয় সভা বা এটা প্রশাসনের ব্যাপারে সরকারের সুদক্ষ উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। বিলের খসড়া এবং মন্ত্রিদের আদেশ ও ঘোষণার বয়ানে সে পরামর্শ দান করে। প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানে সে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। তা ছাড়া, প্রশাসনিক সংস্কারে কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনব্যবস্থার তদারকি কাজেও সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রীয় সভা চারটি বিভাগে বিভক্ত : (১) স্বরাষ্ট্র বিভাগ, (২) অর্থ বিভাগ, (৩) সরকারি পূর্ত ও উন্নয়ন বিভাগ এবং (৪) সামাজিক বিভাগ।

অর্থনৈতিক সভা

চতুর্থ সাধারণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সভা নতুন পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সভা নামে কাজ করছে। এর গঠন ও কাজেরও পরিবর্তন নতুন সংবিধানে ঘটেছে। এর অধিবেশন প্রকাশ্য নয়। অর্থনৈতিক সভার সদস্যগণ সাধারণত বৃত্তিগত ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় সংগঠনের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত। সদস্যগণ তিন বছরের জন্য অর্থনৈতিক সভাতে নিযুক্ত হন। জাতীয়সভার অধিবেশন থাকাকালীন সময়ে এই সভার অধিবেশন বসে। অর্থনৈতিক সভার কাজ প্রধানত পরামর্শদানমূলক। অর্থনৈতিক সভা সরকারকে চারটি বিষয়ে পরামর্শ দান করতে বাধ্য থাকে। বিষয়গুলি হল : (১) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, (২) অর্থনৈতিক সভা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ও বিভিন্ন নিয়মকানুন এবং আদেশ জারিসংক্রান্ত ব্যাপারে, (৩) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে (৪) জাতীয় আয়ের সরকারি হিসাব ও সমীক্ষার ব্যাপারে। এছাড়া অর্থনৈতিক সভা নিজের উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচনা করতে পারে।

পরিশেষে, কোনও কোনও অর্থসংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করাবার জন্য অর্থনৈতিক সভাকে ডাকা হয়।

ফ্রান্সে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে অর্থনৈতিক সভা যেভাবে গঠিত হয়েছে তা বার্কারের, 'সামাজিক পার্লামেন্টের ধারণা'-র বাস্তব রূপ। ফরাসী পার্লামেন্ট হচ্ছে রাজনৈতিক সভা (Political Parliament) কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গঠিত হয়েছে অর্থনৈতিক সভা। বৃত্তিগত ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের অর্থনৈতিক সভা বস্তুত একটি সামাজিক সভা (Social Parliament) সুতরাং পঞ্চম সাধারণতন্ত্র এক্ষেত্রেও শাসনতান্ত্রিক অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।

জরুরি অবস্থা

দেশের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা ফরাসী রাষ্ট্রপতির একান্তভাবে ব্যক্তিগত অভিরুচি ও বুদ্ধি-বিবেচনার ব্যাপার। ফ্রান্সে সাধারণতান্ত্রিক কাঠামো, জাতীয় স্বাধীনতা, দেশের অখণ্ডতা, আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রশ্নে কোন বিপদ দেখা দিলে অথবা দেশে অভ্যন্তরীণ সাধারণ কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটলে রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির জাতির নিকট একটি ঘোষণা জারী করেন ও সাংবিধানিক সভার পরামর্শ গ্রহণ করেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির জরুরি সংক্রান্ত প্রসঙ্গে মন্তব্য যে, "It also made him both judge and jury, since he alone is constitutionally empowered to decide when such circumstances exist and what measures are to be taken to restore normality."

সংবিধানের সংশোধন

চতুর্থ সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের মতোই ১৯৫৮ সালের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের দুই প্রকার পদ্ধতি (১১ ও ৮৯ নং ধারা) আছে।

সংবিধান সংশোধন দ্বারা ফ্রান্সের সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। অর্থাৎ পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের মৌল কাঠামো (basic structure) এবং সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান সংবিধান মতে অপরিবর্তনীয়। এ ছাড়া, ফরাসী জাতির ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট বা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় পরিস্থিতিতে কোনও সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন বা অনুমোদন করা যায় না।

বিচার ব্যবস্থা

ফ্রান্সের বিচারমন্ত্রীর অধীনে বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সাধারণ বিচার (অর্থাৎ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার) এবং প্রশাসনিক বিচার (অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীদের ত্রুটি-বিচ্যুতিজনিত অপরাধের বিচার) দুই ধরনের আদালতে হয়। Droit Administratiff বা প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থার সাহায্যে প্রশাসনিক আদালতে সরকারি কর্মচারীদের ত্রুটি-বিচ্যুতির মামলার বিচার হয়।

উচ্চতর বিচারসভা

সাধারণতন্ত্রের উচ্চতর বিচারসভা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপর্যায়ে সরকারি নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ দান করে, বিচারকগণের নিয়মশৃঙ্খলাজনিত আচরণের ব্যাপারে বিচার করে ও ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করে।

মহাধর্মাধিকরণ

চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের মত পঞ্চম সাধারণতন্ত্রেও জাতীয়সভা দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত মহাধর্মাধিকরণ জঘন্য অপরাধের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে বিচারের কাঠগড়ায় অভিযুক্ত করতে পারে। মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারী নিরপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক অপরাধ করলে মহাধর্মাধিকরণ তাঁদেরও বিচার করতে পারে।

এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া অন্য কোন স্তরে সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। ফ্রান্সের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা দেশের রাজধানী প্যারিস থেকে পরিচালিত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের যুগে বিশুদ্ধ এককেন্দ্রিক সরকারি কাঠামোর উদাহরণ হল ফ্রান্স। বৃটেনে যা 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন', ফ্রান্সে তা হল "স্থানীয় প্রশাসন" (local administration)।

মৌল অধিকার

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে কোনও অধ্যায় বা ধারায় পৃথকভাবে ও নির্দিষ্টভাবে "মৌলিক অধিকার" সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯)-এর সময়ের "মানবাধিকার ঘোষণা" এবং "স্বাধীনতা", "সমতা" ও "সৌভ্রাত্র"-র নীতিকে এই সংবিধানে প্রাথমিক ও প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক-দার্শনিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানেরও ভিত্তি হওয়ায় ঐ সামাজিক-অর্থনৈতিক-দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অধিকারসমূহ বর্তমানে ফরাসী নাগরিকগণ মৌলিক অধিকার হিসাবে ভোগ করেন। এই অধিকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে — (১) প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকার, (২) আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার, (৩) সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (৫) সম্পত্তির অধিকার, (৬) সভা, সমিতি ও রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, (৭) ধর্মঘট করার অধিকার, (৮) দমন পীড়ন প্রতিরোধের অধিকার, (৯) বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের অধিকার, (১০) ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের ফরাসী নাগরিকগণের রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের কোন প্রকার উল্লেখ নেই। তবে ফরাসী নাগরিকগণকে দেশের আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই মৌলিক অধিকারগুলিকে ভোগ করতে হয়। মৌলিক অধিকারগুলি ফ্রান্সে সাধারণ আইনের (ordinary law) দ্বারাই রক্ষিত ও পরিচালিত হয়। দেশের সাধারণ আইন পালন করার মাধ্যমেই ফরাসী নাগরিকেরা তাঁদের কর্তব্যও পালন করে থাকেন।

আধা-রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করে অনেকে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানকে 'রাষ্ট্রপতি শাসিত এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর সংমিশ্রণ' বলে অভিহিত করেন। এই ধরনের মিশ্রিত শাসনব্যবস্থাকে আবার অনেক "রাজতান্ত্রিক শাসনের আধুনিক সংস্করণ" বলে অভিহিত করেন। আর. জি., নিউম্যানের মতে, পঞ্চম ফরাসী সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান হচ্ছে মূলত একটি রাজতান্ত্রিক সংবিধান"। কিন্তু নিউম্যানের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান কোনমতেই 'রাজতান্ত্রিক' বা রাজতন্ত্রের আবরণ নয়। কিন্তু ডরোথি পিক্‌লসের বক্তব্য অনুযায়ী এই সংবিধান দ্ব্যর্থব্যঞ্জক, অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াশাপূর্ণও নয়। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে যে, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান পার্লামেন্টের তুলনায় রাষ্ট্রপতি এবং সরকারকে(President and Government) অধিক শক্তিশালী করা হয়েছে। তাই এই কাঠামোকে 'আধা-রাষ্ট্রপতিশাসিত' (quasi-Presidential) সরকারি কাঠামো বলে অভিহিত করা উচিত।

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান একটি শাসনতান্ত্রিক মডেল হিসেবে অভিনব (a constitutional innovation)। অনেকে মনে করেছিলেন যে, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা "আধা রাষ্ট্রপতি" শাসন-কাঠামো হিসেবে বেশিদিন কাজ করবে না। অচিরে এটা সম্পূর্ণরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অথবা সম্পূর্ণরূপে বৃটেনের মতো সংসদীয় সরকারে পরিণত হবে। কিন্তু বাস্তবে কোনটাই না হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই পঞ্চম সাধারণতন্ত্র দীর্ঘকাল কাজ করে চলেছে।

আবার অনেকে আশংকা করেছিলেন যে, ফরাসী পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান দ্য গল সৃষ্ট সংবিধান বলে দ্য গলের মৃত্যুর পর হয়তো পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকর থাকবে না, পঞ্চম সাধারণতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত

হবে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, দ্য গল মৃত, কিন্তু দ্য গল ব্যবস্থা জীবিত (De Gaulle is dead; Long live De Gaulle)। দ্য গল জীবিতাবস্থায় যে শাসনতান্ত্রিক অভ্যাস জাতির জীবনে গড়ে তুলেছিলেন তা আজও বজায় রয়েছে। ব্যক্তি দ্য গলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দ্য গল রীতি বা দ্য-গল ব্যবস্থার অবলুপ্তি হয় নি।

উপসংহার

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে দ্য গলের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। দেশের স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজনে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র নানা কায়দায় গঠিত। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, সে সংসদীয় কাঠামো বজায় রেখে রাষ্ট্রপতিকে অত্যধিক শক্তিশালী করে তুলেছে। জরুরি আইন ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতি অপেক্ষাও ফরাসী রাষ্ট্রপতি অধিক শক্তিশালী। এই অবস্থায় পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান অনেক জায়গায় গোলমেলে, ঘোলাটে ও দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। এই সংবিধানকে নানা শক্তির সমঝোতা প্রসূত সংবিধান বলা যায়। কেউ কেউ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রকে untidy constitution বলেন। যাই হোক, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি দ্য গলের জীবদ্দশায় তেমন কিছু অপ্রীতিকর সাংবিধানিক বিপর্যয় ঘটে নি। দ্য গল এখন জীবিত নেই কিন্তু দ্য গলের জীবদ্দশায় জাতির যে শাসনতান্ত্রিক অভ্যাস গড়ে উঠেছে তার মৃত্যু হয় নি। তবুও পুরোনো দিনের দ্বন্দ্ব, মতপার্থক্যের দলাদলি ও অভিজ্ঞতা আজকের দিনে ভবিষ্যতের সতর্কতা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কারণ ফ্রান্সে রাজনীতির ঘূর্ণি যত না বাস্তব ও ব্যবহারিক - জ্ঞানগত তার চেয়ে বেশি আদর্শগত ও আবেগ-সঞ্চালিত।

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ পৃথিবীতে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করে নিজের অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক অখণ্ড বিশ্বে নানা ধরনের শাসনব্যবস্থার মধ্যে ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্র একটি বিশেষ রূপ Model হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে 'The principal achievement of the Fifth Republic is to have gained considerable 'legitimacy', that is widespread acceptance that its political institutions are just." অর্থাৎ সংবিধান কর্তৃক গৃহিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানগুলির বৈধতা সার্বিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

১০৫.১১ সারাংশ

এই এককটিতে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পেছনে যে চারটি সাধারণতন্ত্রের উদ্ভব ও পতন ঘটেছিল এবং চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের পতনের পর যে ঘটনাবলী পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই সমস্ত সাংবিধানিক কাঠামোও রাজনৈতিক ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়েছে।

১০৫.১২ অনুশীলনী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন :—

(১) ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সাংবিধানিক ক্রমবিকাশের ধারার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(২) ফ্রান্সের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলির বিবরণ দাও। সেই পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা কর।

(৩) প্যারী কমিউন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা কর।

(৪) তৃতীয় সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণ আলোচনা কর।

(৫) চতুথ সাধারণতন্ত্রের পতনের পর পঞ্চম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অবাধ ঘটনাবলীর বিবরণ দাও।

(৬) পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :—

(১) ডাইরেক্টরী শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল?

(২) নেপোলিয়নের কার্যাবলীর উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ বর্ণনা কর।

(৩) প্যারী কমিউনের কৃতিত্বের বিষয়গুলি কি ছিল?

(৪) প্যারী কমিউনের পতনের কারণগুলি বা ভুল সমূহ উল্লেখ কর।

(৫) চতুর্থ সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

(৬) ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি লিখ।

১০৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১. Dorothy Pickles – The Government and Politics of France, Vol. I and II.

২. Vincent Wright – The Government and Politics of France.

৩. D. H. Hanley, A. P. Kerr and N. H. Waites – Contemporary France.

৪. Alan R Ball – Modern Politics and Government.

৫. J. Devis Derbyshire & Law Derbyshire – Political Systems of the World.

একক ১০৬ ❑ রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা এবং সংসদ

গঠন

১০৬.০ উদ্দেশ্য

১০৬.১ প্রস্তাবনা

১০৬.২ রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১০৬.৩ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

১০৬.৪ রাষ্ট্রপতির ভূমিকা-সালিশী-বিচারক

১০৬.৫ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১০৬.৬ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা পর্যালোচনা

১০৬.৭ তুলনামূলক আলোচনা

১০৬.৮ রাষ্ট্রপতি — ব্যক্তিত্ব ও নীতি

১০৬.৯ মন্ত্রিসভা —সরকারের অন্যমুখ

১০৬.১০ প্রধানমন্ত্রী

১০৬.১১ মন্ত্রিসভা

১০৬.১২ সংসদ

১০৬.১৩ সংসদের গঠন ও কার্যাবলী

১০৬.১৪ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি

১০৬.১৫ আর্থিক বিল অনুমোদন পদ্ধতি

১০৬.১৬ কমিটি ব্যবস্থা

১০৬.১৭ উভয় কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক

১০৬.১৮ সংসদের ক্ষমতা হ্রাস

১০৬.১৯ সংসদের মৌলিক আইন

১০৬.২০ তুলনা

১০৬.২১ সারাংশ

১০৬.২২ অনুশীলনী

১০৬.২৩ গ্রন্থপঞ্জী

১০৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে ফ্রান্সের সরকারের শাসন বিভাগ ও আইনবিভাগ সম্পর্কে সম্যক ধারণার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্সের সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রপতি-ব্যবস্থা ও সংসদীয়-ব্যবস্থার এক সংমিশ্রিত রূপ। তাই সরকার বর্ণনা করার জন্য রাষ্ট্রপতি ও সংসদকে উভয়কে একত্রে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিসভা শাসনবিভাগের দুইটি মুখ হিসাবে কিভাবে কাজ করে এবং সংসদের অর্থাৎ আইনবিভাগের সাথে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার পারস্পরিক সম্পর্ক কি প্রকারে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে বিন্যাস করা হয়েছে তার আলোচনা করাই এই এককের উদ্দেশ্য।

১০৬.১ প্রস্তাবনা

সাধারণভাবে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করা হয়ে থাকে। এই দুইটি পৃথক শাসনকাঠামোর সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। এই দুই ধরণের শাসন কাঠামোর অসুবিধা দূরে রেখে শুধু সুবিধাগুলোকে একত্রিত করে একটি শাসনকাঠামো পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে চালু হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় উভয়ের সংমিশ্রিত রূপ হচ্ছে ফ্রান্সে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের শাসন-কাঠামো। এই মিশ্র-রূপ কাঠামো প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে — একদিকে সরকারের স্থায়িত্ব ও অন্যদিকে সরকারের কাজে জনগণের অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি সুস্থিত ভারসাম্য বজায় রাখা। ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের এই মিশ্র রূপ হচ্ছে একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবিধান থেকে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। এই স্বাতন্ত্রের মূলে আছে যে শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ সেই দুইটিকে বিভাগের আলোচনা এই এককে করা হয়েছে।

১০৬.২ রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে ফরাসী রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন ফ্রান্সের দ্বি-মুখ বিশিষ্ট সরকারের একটি মুখ। যে কোনও দেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির মূল প্রশ্নটি হচ্ছে — 'কে শাসন করে'? পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর জোড়াতালি এক কর্তৃত্ব। ফরাসী শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ভিন্‌সেন্ট রাইটের মতে "With the French Constitution of 1958 we enter the world not of Descartes but of Lewis Caroll. Ambiguity shrouds key areas of decision-making" অর্থাৎ সংক্ষেপে বললে - সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছু কিছু জায়গায় অস্পষ্টতা দেখা যায়।

ফরাসী রাষ্ট্রপতি এখানে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি সমগ্র রাষ্ট্রকাঠামোর স্থায়িত্ব ও প্রবহমানতার মৌল প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি ফরাসী জাতির প্রতীকী ও প্রকৃত শাসক। ফরাসী রাষ্ট্রপতি রাজত্বও করেন, শাসনও করেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ৪৪ বছরে রাষ্ট্রপতি-পদ কার্যক্ষেত্রে দ্য গল শৈলী (the style of general De gaulle) অনুসরণ করেই চলেছে।

ডি. এন. হাসলে. এ. পি. কের এবং এন. এইচ. ওয়েট-এর মতে, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি কেবল নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান নহেন (ওয়ালটার বেজহটের মতে যিনি শুধুমাত্র সরকারের সম্ভ্রান্ত অংশ হিসাবে আনুষ্ঠানিক শোভা বর্ধন করেন),

[clearly the President of the Fifth Republic is no longer merely a constitutional head of state-that part of the executive dealing only with ceremonial, what Walter Bagehot would call 'the dignified parts of government' but a head of state who is politically active as well a key figure in the efficient parts of government.]

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্য গলের ভাষায়, "আমাদের শাসনব্যবস্থার মূল প্রস্তরখণ্ড হচ্ছে নতুন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ, যা ফরাসী জনসাধারণের বুদ্ধি ও অনুভূতি দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধান ও পথ-প্রদর্শক হয়ে উঠেছে। (The keystone of our regime is the new institution of a President of the Republic, designated by the reason and feelings of the French people to be the head of state and guide of France)

রডি, এ্যান্ডারসন এবং ক্রিস্টল এর মতে, "এটা স্পষ্ট যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির চাইতেও ফরাসী পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেন। তত্ত্বগতভাবে না হলেও, বাস্তবে পার্লামেন্টের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিই ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে থাকেন।

১০৬.৩ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

মূল সংবিধানে মার্কিন ধাঁচে নির্বাচনী সংস্থার মারফত পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬২ সালে সংবিধানের ৬ ও ৭ নং ধারার সংশোধিত রূপ হচ্ছে যে, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের (১৮ বছর) ভিত্তিতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে 'দুই ব্যালট' পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। প্রথম ব্যালটে যদি কোন প্রার্থী উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করেন তখন প্রথমে নির্বাচনের তারিখের পরবর্তী রবিবারে দ্বিতীয় ব্যালটে ভোট নেওয়া হয়। দ্বিতীয় ব্যালট ভোটে কেবলমাত্র প্রথমবার ভোট গণনায় শীর্ষ স্থানাধিকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। দ্বিতীয় ব্যালট গণনার সময় সাধারণ গরিষ্ঠতা দ্বারাই ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীকে অবশ্যই প্রথমে প্রার্থীপদের সমর্থনে ১০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমর্থনসূচক স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তি বলতে বোঝায় — পার্লামেন্টের সদস্যগণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যরা, স্থানীয় কাউন্সিলর অথবা মেয়রগণ। এঁদের মধ্যে কমপক্ষে ১০টি ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেন্ট-এর প্রতিনিধি থাকবেন। রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে প্রতি প্রার্থীকে ১০,০০০ ফ্রাঁ জমা রাখতে হয় (জামানত)। যদি কোন প্রার্থী মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৫ শতাংশ লাভ করেন তা হলে জামানতের ১০,০০০ ফ্রাঁ সরকারি কোষাগার থেকে দান করা হয়। রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীকেই নির্বাচনী প্রচারের জন্য বেতার ও দূরদর্শনের প্রচারের সমান সুযোগ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতি পদে একই ব্যক্তির পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কিছু উল্লেখ নেই। ফলে ধরা হয় যে, একজন ব্যক্তি যতবার ইচ্ছা রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পদে যোগ্যতার ব্যাপারেও পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কোন কিছু উল্লেখ নেই। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হবার জন্য বংশ, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ বা জাতীয়তা কোন কিছুরই উল্লেখ সংবিধানে নাই। শুধুমাত্র প্রার্থীকে ২৩ বছর বয়স্ক ফরাসী নাগরিক হতে হয়।

সাংবিধানিক সভা ফরাসী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্তরকম কাজকর্মের পরিচালনা করে, অভিযোগ বিচার করে ও ফলাফল ঘোষণা করে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এবং নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার আগে

নির্বাচন সম্পর্কে কোন অভিযোগ সাংবিধানিক সভার কাছে জানানো যায়। রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচার চলে পনের দিন। এই নির্বাচনী প্রচারকার্য পরিচালিত হয় পাঁচ জন সদস্যের এক বিশেষ কমিশন দ্বারা।

ফরাসী রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ সাত বৎসর। কিন্তু এই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে পারেন অথবা পদচ্যুত হতে পারেন। সংবিধান অনুসারে একমাত্র "রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ" (high treason) সম্পর্কিত অভিযোগ প্রমাণিত হলেই রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগের বিচার করে থাকে ফ্রান্সের উচ্চ-বিচারালয়। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে "গুরুতর রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ"-এর নিন্দাপ্রস্তাব পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে একই রূপে প্রকাশ্য ভোটে এবং প্রতিটি কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদিত হলে উচ্চ-বিচারালয় রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচার করে থাকে।

অবসরগ্রহণকারী রাষ্ট্রপতি কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পঁয়ত্রিশ দিন আগে বা কুড়ি দিনের কম সময়ে নতুন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন করা হয় না। কোনও কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ সেনেটের সভাপতি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। সাংবিধানিক সভা কোন রাষ্ট্রপতিকে অযোগ্য ঘোষণা করলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সেনেটের সভাপতি অস্থায়িভাবে রাষ্ট্রপতির কাজ করেন। তবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১ এবং ১২ নং ধারা সংক্রান্ত গণ-ভোটের ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারেন না — বিশেষত যেখানে সরকারের কোন রাজনৈতিক শাখার সংগঠন বা চুক্তির অনুমোদন বা জাতীয় সভা বাতিল বা যে সমস্ত ক্ষেত্রে ৪৯, ৫০ এবং ৮৯ ধারা অনুযায়ী সরকার পরাজিত হতে পারে ও সংবিধান সংশোধনের ব্যাপার জড়িত থাকে। অযোগ্য রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের সিদ্ধান্তের কুড়ি দিন আগে নতুবা পঁয়ত্রিশ দিনেরও বেশি পরে এই রকম একটা সময়ের মধ্যে সাংবিধানিক সভাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির সঙ্গে ফরাসী রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির তুলনা করে বলা হয় যে, (ক) ফরাসী রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন একটি বিশেষ স্বতন্ত্র নির্বাচক সংস্থা দ্বারা। (খ) ফরাসী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নাগরিকদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করা হয় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন অনুমোদন সিদ্ধ নাগরিক রাষ্ট্রপতি হতে পারেন না। (গ) ফরাসী রাষ্ট্রপতি 'দুই ব্যালট' পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন প্রার্থী যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভে ব্যর্থ হন তবে কোন প্রার্থীকেই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয় না। প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম তিনজন প্রার্থীর নাম প্রতিনিধিসভার নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধি সভা (জাতীয় আইনসভা কংগ্রেসের দ্বিতীয় কক্ষ) ঐ তিনজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করে।

ফরাসী রাষ্ট্রপতি ও মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করে বলা যায় যে, ফরাসী রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি অপেক্ষা বেশি উন্মুক্ত, উদার, সহজ ও সরল।

১০৬.৪ রাষ্ট্রপতির ভূমিকা : সালিশী-মধ্যস্থতাকারী

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের ৫ নং ধারায় ফরাসী রাষ্ট্রপতির ভূমিকাকে সংশোধন করা হয়েছে। ৫ নং ধারায় বলা আছে যে, "ফরাসী সংবিধান যাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রয়োগ হয়, তা রাষ্ট্রপতি দেখবেন। রাষ্ট্রের চলমানতা ও নিয়মিত সরকারি ক্ষমতা তাঁর মধ্যস্থতায় যাতে অনুষ্ঠিত হয় তা দেখাও রাষ্ট্রপতির কর্তব্য। জাতীয় স্বাধীনতা, ভৌগোলিক সংহতি এবং ফরাসী সম্প্রদায়ের সকল চুক্তি ও সন্ধির তিনি রক্ষাকর্তা।" এই সকল আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ব্যতীত

রাষ্ট্রপতি প্রকৃত ক্ষমতাও ভোগ করেন। তাঁর প্রকৃত ক্ষমতার ব্যাপকতা তাঁকে একনায়কতুল্য করে রেখেছে। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের ৫ নং ধারায় লেখা আছে — "The President of the Republic shall see that the constitution is respected. He shall ensure, by his orbitration, the regular functioning of the public powers, as well as the continuity of the state. He shall be the guarantor of national indeyendence, integriti of the territory and respect for community agreements and treaties. অর্থাৎ সংবিধান রক্ষা এবং সেইমত রাষ্ট্রীয় সমাজ ও রাজকীয় নিয়ন্তা রাষ্ট্রপতি তাই ৫নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হলেন ফ্রান্সের সংবিধানের রক্ষক। তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যনির্বাহক এবং রাজনৈতিক কাঠামো ও সরকারের কার্যাবলীর চলিষ্ণুতার ধারক ও বাহক। তিনি ফ্রান্সের জাতীয় স্বাধীনতা, ভৌগোলিক সংহতি এবং আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তির রক্ষক।

সংবিধানের ৮নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন ও তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত ও বরখাস্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণের নিয়োগ ব্যতীত তিনি উচ্চপদস্থ আমলাদেরও নিয়োগ করে থাকেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন সামরিক ও বে-সামরিক পদে তিনি নিয়োগ করে থাকেন। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি কাউন্সিলর অফ স্টেট, গ্রান্ড চান্সেলর অফ্ দি লিজিয়ন অফ অনার, রাষ্ট্রদূত, বিশেষ প্রতিনিধি, আর্থার কাউন্সিল অফ অডিট অফিস, প্রিফেক্ট, সমুদ্রপারের উপনিবেশগুলিতে ফরাসী সরকারের প্রতিনিধি, জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেক্টর এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সংস্থার ডিরেক্টরগণকে নিযুক্ত করেন। ৯নং ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভার সভায় ও ১৫ নং ধারা অনুযায়ী বিচার বিভাগের সর্ব্বোচ্চ সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন।

তিনি বিদেশের দূত ও প্রতিনিধি গ্রহণ করেন ও দেশীয় দূত ও প্রতিনিধি বিদেশে প্রেরণ করেন (১৪ নং ধারা)। রাষ্ট্রপতি দেশের সমরবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক (১৫ নং ধারা)। ৫২ নং ধারা অনুযায়ী তিনি জাতীয় সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন ও অনুমোদন করেন।

মন্ত্রিসভার অনুমোদিত সিদ্ধান্ত ও আদেশগুলিতে তিনি সই করেন (১৩ নং ধারা)। তিনি পার্লামেন্টে আদেশ পাঠান (১৮নং ধারা)। দেশের আইন তিনিই বলবৎ করেন। তিনি আইন বা আইনের কোন অংশ পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টে ফেরৎ পাঠাতে পারেন, তবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত পুনর্বিবেচনার জন্য কোন বিল বা বিলের অংশকে পার্লামেন্ট কখনই গ্রহণ না করে পারে না (১০ নং ধারা)। সমস্ত ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কিত আলোচনার অগ্রগতি সম্বন্ধে তিনি অবহিত থাকেন (৫২ নং ধারা) রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদান করার অধিকার রাখেন (১৭নং ধারা)।

সংবিধানের ১৯নং ধারা অনুযায়ী এই সমস্ত কাজকর্ম অন্যান্য পূর্বতন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির মতই পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ও অন্য একজন মন্ত্রীর দায়িত্বের মাধ্যমে সম্পাদন করেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হয় সংবিধানের ৮নং ধারার ক্ষেত্রে।

৮নং ধারা অনুযায়ী কারও পরামর্শ ছাড়াই রাষ্ট্রপতি নিজ দায়িত্বে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৯৬৪ সালে দ্য গল বলেন যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করার ক্ষমতাও রাখেন। তদানীন্তন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পঁম্পিদু দা গলের ঐ অভিমতকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে বলেন, "রাষ্ট্রপতির আস্থা হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী পদে ক্ষমতায় থাকা-কখনও ভাবা যায় না"।

সংবিধানের ৫নং ধারা ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতিই হচ্ছেন ফ্রান্সের সংবিধানের সর্বময় ব্যাখ্যাকর্তা। ডরোথি পিকলসও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবার অনেকে ৫নং ধারাকে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক বলেছেন। তার ফলে

নানা ধরনের সমস্যা উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমত, ৫নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা কতখানি তা নির্ধারণ করা কঠিন। তিনি কি প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্তও করতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ৫নং ধারা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্ট-এর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষত গণভোটের ক্ষেত্রে, পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করার ক্ষেত্রে ৫নং ধারা রাষ্ট্রপতিকে এক আইন-প্রণেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। তৃতীয়ত, জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতায় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা একেবারে একনায়কের মতোই হয়। তাই ৫ নং ধারা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, এই ধারা ফ্রান্সের সরকারকে কার্যত 'রাষ্ট্রপতির সরকারে' পর্যবসিত করেছে।

কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থার সমর্থকেরা বলেন যে, ৫নং ধারা রাষ্ট্রপতিকে একজন পর্যবেক্ষকের ভূমিকা অথবা আম্পায়ারের ভূমিকা অর্থাৎ সালিশী মধ্যস্থকারীদের ভূমিকা দান করেছে মাত্র। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার সমর্থকেরা দাবি করেন যে, ৫নং ধারা অনুসারে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দেশের সরকার পরিচালনা করতে পারেন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নিজেই ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন। প্রকৃত অবস্থা হল যে, ৫নং ধারা যথেষ্ট অস্পষ্ট এবং তার ফলে রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে যিনি যে ভাবে ৫নং ধারা ব্যাখ্যা করেন সেইভাবেই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

সালিশি মধ্যস্থতাকারী (Arbiter) হিসেবে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি যে সকল কাজ সম্পাদন করেন সেইগুলি হচ্ছে :

(ক) তাঁর কাছে প্রেরিত আইন বা আইনের অংশ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টের কাছে পাঠাতে পারেন।

(খ) সাংবিধানিকতা বিচারের জন্য কোন বিলকে বা কোন চুক্তিকে সাংবিধানিক সভার কাছে পাঠাতে পারেন।

(গ) পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে বা কোন একটি কক্ষে তিনি তাঁর বাণী পাঠ করতে পারেন।

(ঘ) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ অথবা সরকার কিংবা পার্লামেন্ট এবং সরকার যুক্তভাবে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য আবেদন করলে তিনি তা অনুমোদন করতে অথবা বাতিল করতে পারেন।

(ঙ) জাতীয় আইনসভাকে (পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ) কার্যকাল শেষ হবার আগেই তিনি ভেঙে দিতে পারেন।

(চ) ১৬ নং ধারানুসারে তিনিই স্থির করেন যে, দেশের সাধারণতান্ত্রিক কাঠামোর বিপদ, জাতীয় স্বাধীনতার ও ভৌগোলিক সংহতির বিপদ, অথবা আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তি রূপায়ণ প্রতিপালন কিংবা সাংবিধানিক সরকারি কর্তৃত্বের বিপদ কখন উপস্থিত হয়েছে এবং সেইজন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা কখন করা হবে।

সুতরাং উপরিউক্ত কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সালিশী — শাসক হিসাবে ফরাসী পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি তিনপ্রকার কার্য সম্পাদন করেন — (১) স্বাভাবিক কর্তব্য (normal duties) (২) রাজনীতিক অস্থির পরিস্থিতিতে কর্তব্য (Duties in a politically changed situation) (৩) ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে কর্তব্য (Duties in exceptional circumstances.)

এই সমস্ত আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী ছাড়াও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী অসামান্য ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের রাষ্ট্রপতি এত পরিমাণ স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা ভোগ করেন না। সংসদীয় কাঠামো থাকলেও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির ভূমিকা প্রায় একজন একনায়কের মত বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা একেবারেই রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত।

এই ব্যক্তিগত অভিরুচির ক্ষমতায় রাষ্ট্রপতি প্রথমত যে কোন সময়ে, যে কোনো ব্যাপারে, যে কোনও কারণে জাতীয় সভা বাতিল করতে পারেন। এখানে একমাত্র সাংবিধানিক বিধিনিষেধ হল যে, তিনি বছরে একবারের বেশি দুবার জাতীয় সভা বাতিল করতে পারেন না (১২নং ধারা) এ ছাড়া, নামমাত্র একবার আনুষ্ঠানিক পরামর্শ এই ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সভাপতির নিকট হতে গ্রহণ করেন। ফ্রান্সের জাতীয় সভা বাতিল করার প্রকৃত মালিক হলেন রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সভা বাতিলের প্রস্তাব করলেও রাষ্ট্রপতি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। ১৯৬২ সালে বিরোধী দলগুলির যুক্ত প্রচেষ্টায় সরকার সেসব ভোটে পরাজিত হবার পরে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলেও রাষ্ট্রপতি দ্য গল প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি, জাতীয় সভা বাতিল করা তো দূরের কথা। এতে প্রমাণিত হয় যে, ফ্রান্সের সমগ্র শাসন কার্যাবলী কেবলই রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত রাজনীতিক ব্যবস্থা (Personal regime)।

রাষ্ট্রপতির মর্জিমাফিক দ্বিতীয় কাজ হল গণভোটে গ্রহণ করা। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কোন কথা রাষ্ট্রপতি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না (১৯নং ধারা)। কোন সংশোধন বিল গণভোটে না দিয়ে, সাধারণ পদ্ধতিতে অর্থাৎ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনের তৃতীয় পঞ্চমাংশের ভোটে রাষ্ট্রপতি সংশোধনী আইন পাশ করতে পারেন। ব্যাপার যাই হোক না কেন, এক্ষেত্রেও সর্বশেষ সিদ্ধান্ত যিনি গ্রহণ করেন, তিনি রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ১১ নং ধারানুসারে পার্লামেন্ট অধিবেশন চলাকালীন অবস্থায় অথবা পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যুক্ত প্রস্তাবে ও সরকারের প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রপতি সরকার কর্তৃক-সংগঠন, জাতীয় চুক্তি বা চুক্তির অনুমোদন সংক্রান্ত কিছু সরকারি বিল গণভোটে দিতে পারেন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে এই তিনটি বিষয়ে যখন কোন গণভোটের প্রয়োজন হয়েছে তখন প্রধান উদ্যোগ এসেছে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে। উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপতি ১১ নং ধারায় তাঁর অবাধ ক্ষমতা দাবি করে সংবিধানের সংশোধনী বিলকে সরাসরি গণভোটে হাজির করেন। ফলে ৮৯ নং ধারা উপেক্ষিত হয়। এইভাবে পার্লামেন্টকে অমান্য করার ফলে জনপ্রতিনিধিরা সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে আলাপ আলোচনার কোন সুযোগ পেতেন না।

ফরাসী রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার তৃতীয় ক্ষেত্র হল জরুরি অবস্থা ঘোষণা (১৬ নং ধারা)। এই ব্যাপারে, জাতির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি একটি ঘোষণা জারি করে সমগ্র দেশকে জরুরি অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করাই যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতিসাংবিধানিক সভার সঙ্গে ও পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সভাপতির সঙ্গে নামমাত্র আলোচনা করেন। জরুরি অবস্থার সময় রাষ্ট্রপতি জাতীয় সভা বাতিল করতে পারেন না। সেই সময় বিভিন্ন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় সভার মতামত গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর কোনটাই জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রণ করে না। অসাংবিধানিক হলেও এই সময় রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে গ্রহণ করতে পারেন।

এই তিন ধরনের কাজ ছাড়াও প্রথম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে রাষ্ট্রপতি আরও কিছু কাজ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় সম্পাদন করেন। সেই কাজগুলি হল; সেনেট ও জাতীয় সভায় পৃথকভাবে অনুমোদিত সংরক্ষিত পদ, অন্যান্য প্রশাসনিক ও সামরিক পদে নিয়োগ করার ক্ষমতা (১৩ নং ধারা)। মন্ত্রিসভার সমস্ত নির্দেশগুলিতে তিনি সই করেন (১৩ নং ধারা)। সাংবিধানিক সভায় কোন বিল বা আইনের বৈধতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি প্রশ্ন তুলতে পারেন। এই সমস্ত কাজগুলিতে রাষ্ট্রপতি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন।

রাষ্ট্রপতিকে সালিশী বিচারক হিসেবে কিছু কাজ করতে হয়। সংবিধানের ৫নং ধারা অনুযায়ী সংবিধান যাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য করা হয় — সেদিকে দৃষ্টি রাখা রাষ্ট্রপতির কর্তব্য। রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে নিজের বিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্তে সরকারের নিয়মিত কাজকর্ম পরিচালনা করতে রাষ্ট্রপতি চেষ্টা করেন। জাতির স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, জাতীয় চুক্তি ও সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখার রক্ষক হলেন রাষ্ট্রপতি। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র — উভয়ক্ষেত্রে বিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কোনও কিছু মধ্যস্থতা করা — একান্তই রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত দায়িত্ব। অভ্যন্তরীণ

শান্তি, বৈদেশিক নীতি যুদ্ধ সমস্ত কিছু বিষয়ে রাষ্ট্রপতির নিজস্ব বিচক্ষণতা দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিধি প্রায় অসীম ও চূড়ান্ত। যদিও রাষ্ট্রপতি কখনও কখনও তাঁর ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা বা পার্লামেন্টকে delegate করতে পারেন, তবুও সর্বতোভাবে তা রাষ্ট্রপতির বিবেচনা সাপেক্ষ থাকে।

দ্য গল এইভাবে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করে অন্তত তিনবার পার্লামেন্টের উপর তাঁর ব্যক্তিগত আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। প্রথমত, সংবিধানের ২৯নং ধারা অনুযায়ী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দ দাবি করলে পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। কিন্তু পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা সঙ্গত হবে কি না তা দ্য গল নিজের বিবেচনায় দ্বারা স্থির করতেন। দ্বিতীয়ত, ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। সেই সময় পার্লামেন্ট অধিবেশন ছিল। কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশে পার্লামেন্টের অধিবেশন মুলতুবি থাকা অবস্থায় এক বিরাট কৃষক - বিক্ষোভ হয়। এই সময় পার্লামেন্টের সদস্যগণ পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন ডেকে কৃষকদের স্বার্থে একটি বিল উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু পার্লামেন্ট অধিবেশন চলাকালীন মুলতুবি অবস্থায় ছিল, তাই উভয় কক্ষের সভাপতিরাই স্থির করবার অধিকারী ছিলেন যে, কখন মুলতুবি অধিবেশন শুরু হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি দ্য গল বাধা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে ১৬ নং ধারায় তাঁর পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বানের ক্ষমতার সঙ্গে কৃষক বিক্ষোভ বিষয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। পরন্তু তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে পার্লামেন্টের সংশ্লিষ্ট অধিবেশনের উদ্দেশ্যও ভিন্ন — জরুরি অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা। তিনি বলেছিলেন — that the special session, though constitution, ally in order, was politically unnecessary. কারণ পরবর্তী শারদ অধিবেশনে পার্লামেন্টে কৃষি সম্পর্কিত আইনের বিল উত্থাপিত হবে। তৃতীয় ঘটনাটি প্রায় আমরা প্রবাদ মন্তব্যে ব্যবহার করি — রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির সংশোধনী বিল সরাসরি গণভোটে দেওয়া — যা ছিল রাষ্ট্রপতি দ্য গলের ব্যক্তিত্বের এক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য।

ডরোথি পিকলস বলেন, ১৬নং ধারার ক্ষমতা হল রাষ্ট্রপতির 'reserve power in the event of a national disaster অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির সংরক্ষিত ব্যবস্থা কিন্তু সমালোচনার বর্ণনা করা হত এইভাবে — "The objection raised by critics of the article is that its provisions could be deliberately abused by a President seeking personal power and could even serve as technically legal cover for a coup de'tant.

The President alone is entitled to decide when an emergency, as defined by the constitution, exists and what measures should be taken."

ফরাসী রাষ্ট্রপতির এই জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে ফরাসী রাষ্ট্রপতিকে পুনরায় 'সম্রাট নেপোলিয়ন' কায়দায় (Napoleon-style) ক্ষমতা প্রদান করেছে। এই ধরনের জরুরি-ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতি পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে থাকবার ফলে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানকে 'রাজতান্ত্রিক' বা 'সম্রাটীয় সাধারণতন্ত্র' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হয়। পৃথিবীর অন্য কোনও গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ফরাসী রাষ্ট্রপতির মতো ব্যাপক জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করেন না।

তবে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যবস্থার সমর্থনে জোরালো যুক্তি প্রদান করা হত। সেই সকল যুক্তি প্রসঙ্গে ডরোথি পিকলস বলেন যে, Supporters of the Constitution dismissed there objections on the ground that the measures were designed to deal with some remote adn improbable contingency, for which, in any case, detailed provisions would be impossible."

সংবিধানের ৮৯নং ধারা দ্বারা সংবিধান সংশোধন করা হয়। এই ধারা অনুসারে সংবিধান বিল অবশ্যই পার্লামেন্টে প্রেরিত হবে এবং তারপর গণভোটে যাওয়ার কথা। কিন্তু দ্য গল ১৯৬২ সালের "রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংশোধনী বিল" সরাসরি গণভোটে দিয়েছিলেন। সংবিধানের ১১নং ধারার সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত না হওয়া সত্ত্বেও দ্য গল ১১নং ধারা দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর পূবর্তন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অধিক স্বাধীনভাবে ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন, তেমনই কোন কোন ক্ষেত্রে আগের রাষ্ট্রপতিদের তুলনায় কম স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি স্বাধীনভাবে আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন। ১৯৪৬ সালের চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা ছিল না। চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সন্ধি-চুক্তির ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র অবহিত হতেন। এছাড়া চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তুলনায় পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নিয়োগ-ক্ষমতার ব্যাপকতা বেশি। কিন্তু বিচারক্ষেত্রে কাউকে ক্ষমা প্রদর্শন করার ব্যাপারে চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের তুলনায় পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি কম ক্ষমতা ভোগ করেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের একমাত্র মন্ত্রীর স্বাক্ষর সংবলিত আদেশ দ্বারাই রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু চতুর্থ সাধারণতন্ত্রে মন্ত্রীর স্বাক্ষরনামার কোন প্রয়োজন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হত না।

সংবিধানের ৫২নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন ও অনুমোদন করেন। অনুমোদনের জন্য যে সমস্ত চুক্তি তাঁর কাছে উত্থাপিত হয় না সেগুলি সম্পর্কে বিশদ খবর তাঁকে রাখতে হয়। ৫৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সমস্ত রকমের শান্তি ও বাণিজ্য চুক্তি অথবা আন্তর্জাতিক সংগঠন সংক্রান্ত কোন চুক্তির রাষ্ট্রের অর্থকোষ সংক্রান্ত কোন চুক্তি বা আইনের প্রকৃতি বা অর্থ পরিবর্তনকারী কোন চুক্তি, কোন ব্যক্তির পদমর্যাদাসংক্রান্ত চুক্তি ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করার কোন চুক্তি বা ফ্রান্সের সাথে কোন ভূখণ্ডের যোগদান বা ভূখন্ডের বিনিময়ে সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ আইন দ্বারা অনুমো দিত হতে হবে। আইন দ্বারা অনুমোদনের পরেই এই ধরনের কোন চুক্তি বা সন্ধি কার্যকর হতে পারে। ফ্রান্সের ভূখণ্ডের সম্প্রসারণ, বিনিময় বা কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন সংক্রান্ত কোন আইন জনগণের সম্মতি ব্যতিরেকে কার্যকরী হবে না।

এক্ষেত্রে, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের অভিনবত্ব হল যে, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী অথবা পার্লামেন্টের কোন কক্ষের সভাপতি অনুরোধ করলে সাংবিধানিক সভা বিচার করে দেখে কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি সংবিধানের কোনও ধারার বিরোধী বা অসঙ্গতিপূর্ণ কিনা, তাহলে সংবিধান সংশোধন দ্বারা সংশ্লিষ্ট সন্ধি বা চুক্তিকে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়।

শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর বিধি-ব্যবস্থা যেভাবে রচিত হয়েছে তাতে কখনও বলা যায় না যে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সংসদীয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্তর্হিত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্বকে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র শক্তিশালী করেছে।

১০৬.৫ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য যাই থাকুক, ১৯৮৬ সালের মধ্যে ফরাসী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভিন্‌সেন্ট রাইটের মন্তব্য অনুসারে বলা যায় যে, "practice transformed the nature and scope of office." বর্তমানে ফরাসী রাষ্ট্রপতি সাধারণভাবে পাঁচ ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করেন —(১) রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান (২) জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক (৩) পৃষ্ঠপোষকতার উৎস (৪) শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ

(৫) শাসনবিভাগীয় প্রধান। এই পাঁচ ধরনের কার্যাবলীর মধ্যে প্রথম চারটি কার্যাবলী মোটামুটি একই প্রকার থাকলেও শেষ কার্য অর্থাৎ শাসনবিভাগীয় প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতির কার্য রাষ্ট্রপতির রুচি ও মর্জি (taste and temperament) অনুসারে পরিচালিত হয়।

১. রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে অধিক সময় ব্যয় করতে হয়। বিভিন্ন বিদেশী দূত গ্রহণ, বিদেশে স্বদেশের দূত প্রেরণ এবং নিজে বিদেশ ভ্রমণ দ্বারা রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক পদের ভূমিকা পালন করেন। ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে বা অঞ্চলেও রাষ্ট্রপতি সফর করেন। এই সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রপতির সফর রাষ্ট্রপতিকে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করে। আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে এতাবৎ পাঁচজন রাষ্ট্রপতির মধ্যে কিন্তু কাজের শৈলীর (style) পার্থক্য দেখা যায়।

২. জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক হিসেবে ফরাসী রাষ্ট্রপতি হলেন জাতির নেতা, প্রাচীনত্বের প্রতীক, আধুনিকতার অগ্রদূত, ভবিষ্যতের ভবিতব্য। রাষ্ট্রপতি দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য সর্বদাই সর্বসাধারণের নিকট ত্যাগ স্বীকারের আবেদন জানান। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ফ্রান্সের প্রথম রাষ্ট্রপতি দ্য গল জাতির নেতা হিসেবে ১৯৬২ সালে আলজিরিয়ায় সৈন্য বিদ্রোহের সময় জনসাধারণের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন। দ্য গলের মতো নাটকীয় না হলেও রাষ্ট্রপতি মিতঁর ১৯৮২ সালে আর্থিক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে দূরদর্শনের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

৩. রাষ্ট্রপতির তৃতীয় ধরনের কাজ হল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নিয়োগ সংক্রান্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ। সৈন্যবাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং বিচার বিভাগের সর্বোচ্চপদে নিয়োগ রাষ্ট্রপতি দ্বারাই সম্পাদিত হয়। তবে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ক্ষমতা হল প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ। ১৯৮৬ সালের প্রধানমন্ত্রী জাক্ চিরাক ব্যতীত প্রায় সব প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন ফরাসী রাষ্ট্রপতির অনুগত প্রধানমন্ত্রী। শুধু নিয়োগ নয়, প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির প্রভাব কাজ করে। প্রধানমন্ত্রীরা যখন পদত্যাগ করেন, তখন তাঁরা প্রায় বাধ্য হয়েই পদত্যাগ করেন। সুতরাং বলা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ফ্রান্সে সরকার গঠনের ব্যাপারেও ফরাসী রাষ্ট্রপতির পৃষ্ঠপোষকতা কাজ করে।

৪. পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ ফরাসী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। তিনি নিজের পছন্দমতো ব্যক্তিদের মন্ত্রিসভায় এবং উচ্চতর বিচারসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন। ফ্রান্সে ক্রমবর্ধমান প্রভাবশালী সাংবিধানিক পরিষদের নয়জন সদস্যের মধ্যে তিনজন সদস্যকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রদূত, রাষ্ট্রীয় সভার সদস্য, প্রিফেক্ট, শিক্ষায়তনের রেকটর, হিসাব পরীক্ষা সংস্থার পদস্থ ব্যক্তি, সম্প্রচার বিভাগের পদস্থ ব্যক্তি প্রভৃতিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। এই সমস্ত নিয়োগ দ্বারা সমগ্র দেশের চেহারাকে রাষ্ট্রপতি এক বিশিষ্টরূপে মণ্ডিত করতে পারেন। প্রথম রাষ্ট্রপতি দ্য গল তাঁর নিয়োগ ক্ষমতা দ্বারা ফ্রান্সকে দ্য গলীয় রাষ্ট্রে (the Gaullist state) পরিণত করেছিলেন। দ্য গল নিযুক্ত ব্যক্তিদের দেশের প্রশাসন থেকে সরিয়ে দিয়ে গিসকার্দ রাষ্ট্রপতি হিসেবে সমস্ত পদে নিজেদের পছন্দমতো ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। তার ফলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় চেহারা হয় 'গিসকার্দীয়' রাষ্ট্রব্যবস্থা (Giscardian state)। ১৯৯৩ সালে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি মিতঁর একই ধারা অনুসরণ করে নিয়োগ কার্য পরিচালনা করায় সমাজতন্ত্রী দলের লোকেরাই সর্বত্র নিযুক্ত হতেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ফ্রান্সে কিন্তু "spoils system" প্রচলিত নেই। কেবল উচ্চতর ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতি নিজ পছন্দ ব্যক্তিদের নিয়োগ করে থাকেন। ফ্রান্সের সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ সম্পন্ন হয় আইন দ্বারা, গরিষ্ঠতার হিসেব দ্বারা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি দ্বারা। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে প্রমাণিত যোগ্যতা দ্বারাই ফ্রান্সে নিয়োগ-নীতি

পরিচালিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এমনভাবে তাঁর নিয়োগ কার্য সম্পন্ন করেন যাতে তাঁর বিশ্বস্ত অনুগতরা পুরস্কৃত হন এবং তাঁর প্রতি বিরক্ত ও বিদ্রোহীরা শাস্তিপ্রাপ্ত হন। এইভাবে রাষ্ট্রপতি তাঁর নিয়োগ ক্ষমতা দ্বারা তাঁর ব্যক্তিগত দলবল ভারী করে থাকেন। কাজের ফলে ফ্রান্সে শাসনব্যবস্থা কার্যত রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়।

৫. ফরাসী রাষ্ট্রপতির চতুর্থ ধরনের কাজের প্রকৃতি রাজনৈতিক। ১৯৫৮ সালের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে রাজনৈতিক দায়িত্বশূন্য (politically non-responsible) বলে ঘোষণা করার অর্থ ছিল রাষ্ট্রপতিকে রাজনীতির উর্ধ্বে (above party-politics) রাখা। কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেক রাষ্ট্রপতিই নিজেকে দেশের রাজনীতির সাথে যুক্ত করে চলেছেন। কারণ সরকারের কার্যকরী প্রধানরূপে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিই সরকারি নীতির স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং বিরোধীদের বক্তব্য খণ্ডন করেন। রাষ্ট্রপতি নিজের কাজের সমর্থনের জন্য নিজ দলের সদস্য, কর্মী, সমর্থকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন এবং নিজ সমর্থন-ভিত্তি (support base) বজায় রাখেন। সর্বোপরি তিনি নির্বাচনী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। প্রথমত, তিনি সরকারের সাধারণ মুখপাত্র এবং প্রধান পরিচালক (১৯৮৬-৮৮ সাল বাদে), দ্বিতীয়ত, তাঁর সমর্থনকারী কোয়ালিশনের ঐক্যের তিনি অভিভাবক এবং তৃতীয়ত, ঐ কোয়ালিশনের নির্বাচনী রাজনীতির পরিচালক, পথ-প্রদর্শক এবং এজেন্ট।

রাষ্ট্রপতির পঞ্চম এবং সর্বশেষ ধরনের কাজ হল নীতি প্রণয়ন। নীতি-প্রণেতার ভূমিকায় তিনি নির্দেশক। প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাঁর সহকর্মী নহেন, তাঁরা রাষ্ট্রপতির অনুগত ভৃত্য। কারণ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের অক্ষরগুলিকে সময়ে অসময়ে ক্ষুণ্ণ করে চলা এবং সংবিধানের আত্মাকে দৃঢ়ভাবে লঙ্ঘন করা ফরাসী রাষ্ট্রপতিদের কাজের শৈলী (style)। রাজনৈতিক জুজুর ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্রপতিগণ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাজত্বকালে তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে পঁম্পিদু দেশবাসীকে দক্ষিণপন্থী জুজুর ভয় ও কমিউনিজমের ভূতের ভয়ও দেখিয়েছিলেন। গিসকার্দ দাস্তাঁই নিজেকে বামশক্তি-বিরোধীদের নেতা বলে ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম রাষ্ট্রপতি দ্য গল যেভাবে আলজেরীয় যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন তা এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। দ্য গল, পঁম্পিদু, দাঁস্তাই জাঁক সিরাক প্রত্যেকেই পূর্বতন রাজত্বের অপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন। দ্য গল বলেছিলেন যে, চতুর্থ সাধারণতন্ত্র ছিল বিশৃঙ্খলার রাজত্ব (chaotic and unstable regime)। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শৃঙ্খলা আনা। তাই শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর স্বাভাবিকের তুলনায় ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ৪৮ বছর পরেও জাঁক সিরাক ঐ একই সুরে চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের দলপ্রথার কুফলের কথা স্মরণ করে বলেছেন "ঐ কালো দিনগুলি যাতে আর ফিরে না আসে" তারজন্য রাষ্ট্রপতিকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এইভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য ফ্রান্সের সকলেই (প্রধানমন্ত্রী, সরকার, পার্লামেন্ট, অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী) স্বীকার করেছিলেন। ফরাসী জনসাধারণের কাছে রাষ্ট্রপতিই ছিলেন ফ্রান্সের প্রকৃত ক্ষমতাকেন্দ্র। ফ্রান্সের নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট বিবেচনার বিষয় থাকে একটাই — কোন্ ব্যক্তির উপর দেশ শাসনের দায়িত্ব থাকছে? ১৯৫৮ সালের সংবিধান এবং ১৯৬২ সালের সংবিধান সংশোধনের আইনের মধ্যেই আজকের দিনের ঐ প্রশ্নের উত্তর ফরাসী লোকেরা খুঁজে পেয়েছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ব্যাপ্তিতে। তবে সরকারের প্রধান হিসেবে ফরাসী রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতা বৃদ্ধি একেবারে সাম্প্রতিককালের ঘটনা।

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে হ্যানলে, কের এবং ওয়েটস্ মন্তব্য করেছেন যে, "পঞ্চম সাধারণ তান্ত্রিক সংবিধান যেরূপে নানাভাবে ব্যাখ্যায়িত হয় এবং সংবিধান নিজেই স্বেচ্ছাচারীভাবে পরিচালিত

২য় তাতে স্বৈরতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রবণতা সংবিধান নিজেই বহন করে চলে, কারণ রাষ্ট্রপতি নিজেই সংবিধানের ব্যাখ্যা দ্বারা নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ফলে স্থিতিশীলতার পরিবর্তে সুদূর ভবিষ্যতে এই সংবিধান এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যেখানে সংবিধানের এক প্রকার ব্যাখ্যা অপর এক ব্যাখ্যাকে বাতিল করবে এবং এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি উদ্ভূত হবে যা কেবল তাত্ত্বিক বিতর্কেই সীমিত না থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধ সৃষ্টি করবে এবং তার ফলে সরকারের ঘন ঘন উত্থান-পতন ঘটবে এবং বৈপ্লবিক বৈধতা লাভ করবে।

১০৬.৬ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা পর্যালোচনা

১৯৫৮ সালের পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি এর কম বা বেশি কোনটাই নন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য বহন করে। প্রথমত, শাসন বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত — রাষ্ট্রপ্রধান (রাষ্ট্রপতি) ও মন্ত্রিসভা (সরকার)। এই মন্ত্রিসভার নেতা প্রধানমন্ত্রী সহ সমস্ত মন্ত্রিসভা নীতি নির্ধারণ ও নীতি রূপায়ণের জন্য জাতীয় সভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

রাষ্ট্রপতি তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রেও মতই পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ও রাজনৈতিক দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান নন। কয়েকটি ক্ষেত্রে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি অন্যান্য সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ভোগ করেন আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কম ক্ষমতা ভোগ করেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের পরিধি খুবই অল্প হওয়ায় পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি সর্বসাকুল্যে অত্যধিক ক্ষমতা ভোগ করেন। দ্য গলের শাসনকালে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে যথেষ্টভাবে বজায় আছে, যথা-আইনসভার নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দ্বারা মন্ত্রিসভা বা সরকার গঠন এবং আইনসভার নিম্নকক্ষের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতি দ্য গল তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার বা অত্যধিক ব্যবহার করেছিলেন। ফলে, ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থা প্রায় রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে মনে হয়। যদিও এই মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক, তা হলেও দ্য গলের উদাহরণে স্রষ্টা হয়ে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে বলেন যে, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান বস্তুত tailor-made for general De-Gaulle। আবার কেউ কেউ কিঞ্চিৎ ভিন্ন উক্তি করেন যে, প্রথম থেকে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান tailor-made for De-Gaulle ছিল না। পরবর্তী বছরগুলিতে সংবিধান সংশোধন দ্বারা ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান ক্রমে ক্রমে tailor-made for De-Gaulle হয়ে পড়েছিল।" দ্য গলের ভাষায় : 'রাষ্ট্রপতি যেহেতু জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন, তাই রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হলেন রাষ্ট্রপতি'। যাই হোক, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান হল দুই বিপরীত গণতান্ত্রিক রূপের-সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার-সংমিশ্রিত (queen mixture of Parliamentary and Presidential form of govt.)। এই কাঠামোতে, সীমিত ক্ষমতার পার্লামেন্ট ও একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রপতি আছেন। বস্তুত এই সাধারণতন্ত্রে প্রশাসনিক নৌকার কাণ্ডারী হলেন রাষ্ট্রপতি। দ্য গলও এই অভিমতে একমত হয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিধির ব্যাপকতার নানা সম্ভাবনা দেখেছিলেন। বিশেষত সংবিধানের ৫নং ধারাতে, তাঁর ব্যাখ্যায়, রাষ্ট্রপতিকে দেশের প্রকৃত নেতা করা হয়েছে। দ্য গলের সময় বাস্তবিক পক্ষে ফ্রান্সের জনসাধারণ রাষ্ট্রপতি দ্য গলকেই প্রকৃত নেতা বলে মনে করতেন। রাষ্ট্রপতির অনেক কাজ বিশেষত পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে অনেক সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই গ্রহণ করে বলবৎ করতেন। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা এমন কি পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীও দ্য গলের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জনসাধারণের একজনের মতোই খবরের কাগজের পাতায় প্রথম দেখতেন। দ্য গলের এই অদ্ভুত ক্ষমতা ও মন্ত্রিসভার নির্জীবতা সম্পর্কে ফ্রাসোঁয়া মিতঁর ও কস্তা ফ্লরেৎ

সমালোচনা করেছিলেন। অন্যদিকে, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পঁম্পিদু, দ্য গলের কাজকর্মকে অন্ততঃ অসাংবিধানিক বলে ভাবেন নি। বরং ১৯৬২ - তে গণভোটে দ্য গলের বিতর্কিত সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে জনগণের বিপুল অংশ রায় দেওয়ায় দ্য গলের কাজকর্মকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ - সাংবিধানিক বলে মনে করতেন। ১৯৭০ সালে দ্য গলের মৃত্যুর পর পঁম্পিদু বলেছিলেন — Genera! De Gaulle is dead, France is a widow."

দ্য গলের মৃত্যুর পর নির্বাচনে পঁম্পিদু ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি হন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি দ্য গল থেকে পৃথক কোন কিছু অদ্বিতীয় ছাপ সৃষ্টি করেন নি বা দ্য গলের ধারণার কোনও জোড়াতালি দেন নি। পঁম্পিদু পূর্ণাঙ্গভাবে দ্য গলপন্থী ছিলেন। কিন্তু দ্য গলের ন্যায় ব্যক্তিতসম্পন্ন ছিলেন না। পঁম্পিদুর শাসনকাল খুব অল্প। পঁম্পিদু অকালে মারা যাওয়াতে নতুন করে নির্বাচন হয়েছিল। তারপর ফরাসী দেশের রাষ্ট্রপতি হন দেস্ত্যাঁ। দেস্ত্যাঁর পর মিতঁর রাষ্ট্রপতি হন। তিনি গলপন্থী নন। তবে তাঁকে দ্য গল কাঠামোর বিরোধীও ঠিক বলা যায় না। এক কথায়, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার নানা সম্ভাবনাময় দিক থাকায় রাষ্ট্রপতিপদে আসীন ব্যক্তি যা হতে চান — ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির কাঠামোর সাংবিধানিক রূপ তাই হয় — একথা অত্যুক্তি নয়।

১০৬.৭ তুলনামূলক আলোচনা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তুলনা করলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতার মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক সুযোগসুবিধা যত বেশি আছে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি সেই তুলনায় শাসনতান্ত্রিক একনায়কত্বের সুযোগ কম ভোগ করেন। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক সুযোগ কম থাকলেও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি বাস্তবিকপক্ষে মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতই দাপটে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির ভাবমূর্তিই ফ্রান্সের পরিচয়।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও ফরাসী রাষ্ট্রপতি উভয়েই শাসনবিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করলেও মার্কিন রাষ্ট্রপতি একক-শাসক অন্যদিকে ফরাসী রাষ্ট্রপতি হলেন দ্বি-মুখাবিশিষ্ট শাসনবিভাগের একটি মুখ। অর্থাৎ ফরাসী রাষ্ট্রপতির উপর রয়েছে ফ্রান্সের শাসনবিভাগের আংশিক কর্তৃত্ব। এই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির প্রক্রিয়াতেও পার্থক্য রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা অন্যদিকে ফ্রান্সে রয়েছে বহুদলীয় ব্যবস্থা। এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পার্থক্য উভয় দেশের রাষ্ট্রপতির মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পার্থক্যের জন্য যদি মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফরাসী রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হন, তাহলে ফ্রান্সে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা ফরাসী রাষ্ট্রপতি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ভূমিকা পালন করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভা বলে কিছু নেই। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভাসহ পার্লামেন্টকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের কাজ পরিচালনা করেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকে সংসদীয় নিয়মকানুন মানতে হয়। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে তা করতে হয় না। তাঁর সচিব সভা একান্তভাবে তাঁর ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা কমিটি। এই ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা সুউচ্চ অবস্থায় আছেন। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যথা — আইনসভার প্রতি দায়িত্বশীলতা — উভয়ের কারও নেই। ইম্পীচমেন্ট পদ্ধতি উভয়ের ক্ষেত্রেই আছে। দেশের শাসনব্যবস্থার উপর উভয় দেশের রাষ্ট্রপতিগণ প্রায় সমান ক্ষমতায় প্রভাব বিস্তার করেন।

ফ্রান্স এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হওয়ায় ফরাসী রাষ্ট্রপতির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাত্রা অনেক বেশি। মার্কিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র হওয়ায় অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য (autonomy)। মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করতে হয়। ফরাসী রাষ্ট্রপতির এই ধরনের কোন বালাই নেই।

এককথায় বলা যায় যে — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি উভয়ে নিজ নিজ দেশের সর্বোচ্চ প্রকৃত শাসক ও জননেতা। পার্থক্য যা, তা কেবল দুই দেশের রাজনৈতিক নানা সংস্কৃতির জন্য, আমেরিকান রাজনৈতিক-সংস্কৃতি ও ফরাসী রাজনৈতিক-সংস্কৃতির ভিন্নতার জন্য। আর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি একক শাসক(single executive) কিন্তু রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় রূপের মিশ্র গণতন্ত্র হওয়ায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি একক শাসক নন। মন্ত্রিসভা হল ফ্রান্সের সরকার, আর রাষ্ট্রপতি হলেন ফ্রান্সের রাজনৈতিক নেতা।

তাই শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে উভয়েই সমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সংগঠন হিসেবে কাজ করেন। সুতরাং দুই দেশের রাষ্ট্রপতির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনায় বলা যায় যে-দুই দেশের দুই রাষ্ট্রপতি একটি তাসের দুইটি পিঠ।

সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির বস্তুত কোন তুলনা হয় না। উভয়দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সামগ্রিকভাবে সংসদীয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত রূপের হলেও সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীর প্রথম জন। সুইজারল্যান্ডের ৭ জন সদস্যের রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী হতে প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে এক বছরের জন্য রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীর 'প্রথম জন' হিসাবে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করেন।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিতে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ১৯৮২ সালের সংবিধানে নতুনভাবে সৃষ্ট রাষ্ট্রপতি পদের সঙ্গে কিছুটা তুলনীয়। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুসারে কেবল আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু সরকারের কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি নিজের দায়িত্ব কোন ক্ষমতা প্রয়োগ না করে জাতীয় কংগ্রেস ও তার স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইন ঘোষণা করেন বা সরকারি আদেশ জারী করেন, প্রধানমন্ত্রী , উপপ্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের মহাসচিবকে নিযুক্ত ও অপসারিত করেন। জাতীয় গণকংগ্রেস ও তার স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রীয় পদক ও সম্মানজনক উপাধি বিতরণ করেন, বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, সামরিক আইন জারী ও যুদ্ধ ঘোষণা এবং সৈন্য সমাবেশ করেন।

কিন্তু প্রজাতন্ত্রী চীন একদলীয় সরকারের রাষ্ট্র। উপরন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন দেশের এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা জাতীয় গণ কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির দ্বারা। কিন্তু ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ফরাসী জনসাধারণ দ্বারা এবং তিনি কাজ করেন বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে। তার ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের রাষ্ট্রপধান, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তি নন। অন্যদিকে, গণ প্রজাতন্ত্রী চীনের মতই ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল শাসক না হয়েও দেশের প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ করেন। গণ প্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি যেখানে দেশের নায়ক হিসেবেই জনসাধারণের কাছে গণ্য হন না, সেখানে ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি দেশের মানুষের কাছে প্রায় একনায়ক হিসেবে পরিগণিত হন।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রপতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য হল যে, দুজনকেই সংসদীয় রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। তবে ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোতে রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক মাত্র। ৪২তম সংবিধান 'সংশোধনী আইনের পর ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ইংলন্ডের রাণীর চেয়েও কম। অন্যদিকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেক বেশি। জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ও গণভোট গ্রহণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে প্রায় প্রকৃত শাসক হিসেবে ফ্রান্সের প্রথম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ডরোথি পিকলসের মন্তব্য উদ্ধৃত করে ফরাসী রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আলোচনা শেষ করা যায়। ডরোথি পিকলস মন্তব্য করেছেন — 'The general assumption that the President and not the Prime Minister is the real source of power in the Fifth Republic is based not on the nature of the Presidential functions as defined by the constitution, but on the imponderables related to personalities and to the problems of the first year of the regime, as well as General De Gaulle's own interpretation of his role – on what has come to be

known as 'the style of the General'. আসলে ফরাসী শাসনতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অনেকটাই স্থির হয়ে গেছে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রধানতম স্থপতি রাষ্ট্রপতি দ্য' গলের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের ছাঁচ অনুসারে।

১০৬.৮· রাষ্ট্রপতি — ব্যক্তিত্ব ও নীতি

পুরনো প্রবাদ ছিল যে, পদমর্যাদা মানুষকে তৈরি করে থাকে (Office makes the man). কিন্তু ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে দেখা গেল মানুষ পদমর্যাদাকে তৈরি করেছে (Man has made the office)। ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ প্রকৃতপক্ষে প্রথম রাষ্ট্রপতি দ্য গলের ধাঁচে (pattern) তৈরি হয়েছে। ভিন্‌সেন্ট রাইটের ভাষায় বলা যায় যে, "The French Presidency, its powers, and its functioning owea great deal to the will, the style and the personality of the incumbent President." আসলে রাষ্ট্রপতির নিজস্ব ব্যক্তিত্বের একটা গুরুত্ব রাষ্ট্রপতির পদের প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হয়। তাই ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতার নির্ধারণে ও মূল্যায়নে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অপরিসীম। ফরাসী সরকারের নীতি নির্ধারণে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্বের গুরুত্বই কার্যকর হয়ে থাকে। সুতরাং ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব ও নীতির এক অনন্য বিশিষ্টতা রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি দ্য গলের আমলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ফ্রান্সের আইন, শাসন ও রাজনীতি সামঞ্জস্যপূর্ণরূপে একযোগে একই ধারায় কাজ করেছিল। কারণ দ্য গল নিজের ব্যক্তিত্বে ফরাসী সমাজজীবনের কৃষ্টিকে প্রকাশ করেছিলেন। ফলে ফরাসী সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকেরা প্রায় বিনা প্রশ্নে তাঁর কর্তৃত্বের বৈধতা ও নৈতিকতাকে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর কর্তৃত্বকে ফরাসী জনগণ আইন বা সংবিধানের ভিত্তিতে বিচার করে নি। তাঁর কর্তৃত্বের ভিত্তি ছিল তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও তাঁর কর্মনীতি। দ্য গলের ব্যক্তিত্বের গঠন ও প্রয়োগের লক্ষ্য ছিল - রাষ্ট্র ও সরকারকে শক্তিশালী করা। তাঁর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ তাঁকে এক অগাধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তুলেছিল। একটি বৈধ, সাধারণতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক শক্তিশালী সরকার গঠনের লক্ষ্যের মূলে ছিল তাঁর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ। এ লক্ষ্যে তিনি প্রায় একজন একনায়কের (dictator) মতো আচরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো মতেই খারাপ বা কুৎসিত একনায়ক (vulgar-dictator) ছিলেন না। দ্য গল ছিলেন ইতিহাসজ্ঞানসম্পন্ন একজন লেখক, দার্শনিক এবং সেই সঙ্গে একজন কর্মবীর। তিনি ছিলেন বেপরোয়া সাহসের অধিকারী। একদিকে তিনি ছিলেন বীর অসম-সাহসী যোদ্ধা এবং অন্যদিকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এক সাহসী পুরুষ, যাঁর ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নাটকীয়তা। প্রয়োজনে ও পরিস্থিতি অনুসারে তিনি নীরবতা ও গোপনতা অবলম্বন করতেন এমন কি শঠতাও অবলম্বন করতেন।

জেনারেল দ্য গল নিজের জীবনকে বিভিন্ন স্তরে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের মূল্যবোধের প্রতীকী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর স্বপ্ন ও কর্মের এক বেপরোয়া রূপকার। তিনি নিজেকে সবসময় 'তৃতীয় পুরুষ' (third person) হিসেবে বর্ণনা করতেন। এই অসাধারণ ব্যক্তিটি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিলেন তাঁর নিজেরই তৈরি অতিকথার অন্তরালে এক বন্দী-ব্যক্তিত্ব। দশ বছর রাষ্ট্রপতির কাজ পরিচালনার পর যখন তিনি পদত্যাগ করেন, তখন তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীকে অর্পণ করে যান একটি ক্ষমতাবান ও পদমর্যাদাময় রাষ্ট্রপতির পদ।

জেনারেল দ্য গলের পর রাষ্ট্রপতি হন জর্জ পঁম্পিদু। তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়াটা ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ১৯৬২ সালে যখন তিনি রাষ্ট্রপতি দ্য গল কর্তৃক ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন ফরাসী জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি নাম। ফ্রান্সের চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সময় তিনি ছিলেন একজন

স্কুল শিক্ষক এবং জেনারেল দ্য গলের একজন সহযোগী। এই সময় তিনি বেশ কিছু ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে আসেন এবং জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করেন এবং চিত্রকলা ও সাহিত্যরসিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে তিনি সুস্থ জীবনযাপন শুরু করেন (He made money, read poetry and lived a good life)। পঁম্পিদু প্রায় ছয় বছর ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং এই দীর্ঘকাল প্রধানমন্ত্রী থাকা ফ্রান্সে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ শেষে তিনি একজন দক্ষ বাগ্মী, সংসদীয় বিতার্কিক, গরিষ্ঠদলের প্রতিষ্ঠিত নেতা এবং নিজস্ব গণভিত্তিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ রূপে ফ্রান্সের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের একজন নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সর্বোপরি, তিনি নিজেকে দ্য গলের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পোহের (Poher)-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি দ্বিতীয় ব্যালটে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জেনারেল পঁম্পিদু তার রাজত্বকালে রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন। তিনি বেশির ভাগ সময় ভ্রমণে ব্যস্ত থাকতেন এবং মন্ত্রিসভার সভায় সভাপতিত্ব করতেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিগণকে, এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত সহায়ক কর্মীদের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটিই তাঁর ছিল না। ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সরকার পরিচালনার ধরনে (style) পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতার পরিবর্তে তাঁর নির্লিপ্ততা, দীর্ঘসূত্রতা, ব্যক্তিগত আমোদপ্রিয়তা, উদাসীনতা, প্রাজ্ঞ-ধরনের রক্ষণশীলতা, পার্থিব জগতের প্রতি অনীহা এবং ধর্মীয় প্রবণতা ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির কার্যধারায় প্রতিফলিত হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ ফরাসী পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সুসন্তান পঁম্পিদু শেষ জীবনে গির্জার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

ফরাসী পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন ভালারে গিসকার্দ দাস্তেঁই। তিনি ও পঁম্পিদু ছিলেন একই এলাকার (Auvergne) লোক। এখানেই এই দুইজনের মধ্যে সাদৃশ্যের ইতি। বাকী সব ক্ষেত্রে গিসকার্দ ছিলেন এক পৃথক ধারার ব্যক্তিত্বের রাষ্ট্রপতি। গিসকার্দ ছিলেন এক প্রাচীন অভিজাত বংশীয় পরিবারের সন্তান। তাঁর পরিবারের পূর্বসূরিদের অনেকেই ছিলেন ফ্রান্সে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদের অধিকারী। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ফ্রান্সের ধনাঢ্য শিল্পপতির কন্যা। তাঁর আত্মীয়দের অনেকেই ছিলেন ব্যাঙ্ক, শিল্প-ব্যবসায়ে, আমলাতন্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, তাঁর পরিবার-পরিমণ্ডল থেকে গিসকার্দ লাভ করেছিলেন প্রভূত সম্পদ, বহু রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং প্রখর বুদ্ধি। তাঁর প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর স্কুল জীবনে ফ্রান্সের দুই অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়ে দেশের মর্যাদাসম্পন্ন অর্থ-আধিকারিকের পদে যোগদান করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রীর অধীনে কাজ করার সময় তিনি জীবনে প্রথম রাজনীতির স্বাদ লাভ করেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি দ্য গলের অর্থমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন। দ্য গল তাঁকে সাধারণ ভৃত্যের মতন বরখাস্ত করেছিলেন। কারণ দ্য গল মনে করেছিলেন যে, ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দ্য গলের জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ ছিল তাঁর অর্থমন্ত্রী হিসেবে গিসকার্দের জনবিরোধী অর্থনৈতিক নীতি। সেই সময় থেকেই দুজনের সম্পর্ক তিক্ত হয়। গিসকার্দ দ্য গলকে কর্তৃত্ববাদী বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে তিনি পঁম্পিদুর সমর্থকে পরিণত হন। পঁম্পিদুর রাষ্ট্রপতির সময়ে তিনি বরাবর অর্থমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলেন। পঁম্পিদুর মৃত্যুর পর গিসকার্দ যে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হবেন তা ছিল একেবারে নিশ্চিত। প্রথম ব্যালটে দ্য গল পন্থী চবন দেলমাসকে পরাজিত করে, দ্বিতীয় ব্যলটে বামপন্থী মিতরঁকে পরাজিত করে তিনি ফরাসী পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত হন।

ফরাসী পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে গিসকার্দ দস্তাঁই ছিলেন কয়েকটি প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী। প্রথমত, তিনি ছিলেন একজন ভালো লোক(nice man)। দ্বিতীয়ত, তিনি ছিলেন নিজ ভাবমূর্তি গঠনে সদ্য সচেতন। বলা হয় যে, "If De Gaulle was a slightly strict father and Pompidou a jovial uncle, Giscard d'Estating was the clever brother." তৃতীয়ত, তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য,গতিশীল, যৌবনদীপ্ত এবং হাল্কাচালের ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর এই হাল্কাচালে চলার ফলে রাষ্ট্রপতির কাজের ধরনে (Style of the Presidency)-র পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্রপতির

কার্যালয়ে কঠিন আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনের পরিবর্তে নমনীয় ও আন্তরিক পরিবেশ তিনি তাঁর রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্যকালের প্রথম দিকে বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে একধরনের রাজতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা এবং বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার বাতাবরণ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে চালু হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর লক্ষ্য হল রক্ষণশীল — ভীরুতা এবং বিপ্লবী-বিরোধিতা মুক্ত একটি চিন্তাশীল ও শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর মনে হয়েছিল যে, ফ্রান্সে সামাজিক অশান্তির মূল কারণ সামাজিক নয়, আদর্শগত। তাই তিনি দেশকে বুর্জোয়া এবং প্রোলেতারিয়েত এই দুই শিবিরের মধ্যে বিভাজন করার বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন ফ্রান্সে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রবক্তা - যা ছিল তাঁর মতে, "capable, eventually of integrating the whole of Frech society". তাঁর এই ধারণার মধ্যে স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ একদিকে তিনি যখন বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের (Pluralism) কথা বলেন, অন্যদিকে তখনই তিনি বহুত্ববাদের ফল হিসেবে শ্রেণী বিরোধকে (Class-conflict) অস্বীকার করেন। শেষদিকে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কথা ছিল বহুত্ববাদ, কিন্তু কার্যধারা ছিল কর্তৃত্ববাদী। তাঁর ফলে ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

১৯৮১ সালের মে মাসে প্রথমবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন ফ্রাসোঁয়া মিতরঁ। গিসকার্দের বন্ধু মাইকেল পানাতোস্কিকে তিনি পরাজিত করেছিলেন। চিরকাল পরাজিত মিতরঁ যখন ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন সেই জয়লাভকে মিতরঁ-র ব্যক্তিগত জয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হবার আগে মিতরঁ-র ছিল এক দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় জীবন। তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত ক্যাথলিক পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা ছিলেন একজন রেলওয়ে অধিকর্তা। আইন-অধ্যয়ন শেষে তিনি প্যারিস বার-এ ওকালতি শুরু করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তিনি ওকালতি ছেড়ে দেন। তিনি Resistance Movement-এ যোগদান করেন। যুদ্ধ শেষে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং নিজেকে একজন দক্ষ প্রশাসক ও প্রভাবশালী সংসদীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার আগে তিনি Chatean Chinonf-এর মেয়র পদে ছিলেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রকালে তিনি তাঁর স্থানীয় গণভিত্তি মজবুত করে একটি শক্তিশালী ক্ষমতার ভিত্তি (power base) তৈরি করেন এবং বরাবর নিজেকে দক্ষিণপন্থীবিরোধী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৬০ সাল থেকে নিজের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে দুটি ধারায় প্রবাহিত করেছিলেন (১) অ-কম্যুনিস্ট বামপন্থীদের নেতৃত্বদান এবং (২) নিজস্ব শক্তির উপর দাঁড়িয়ে কম্যুনিস্টদের সাথে নির্বাচনী সমঝোতা করা। ১৯৮১ সালের মধ্যে প্রথম লক্ষ্যকে অর্জন করেন। ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি পরাজিত হন। কিন্তু পরাজয়ের পর তিনি কখনই তাঁর উল্লেখিত দুটি লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করেন নি। দক্ষিণপন্থীর সমালোচনা ও বামপন্থীদের ঐক্য গঠন ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও তিনি পরাজিত হন। তাঁর এই বারবার পরাজয় সত্ত্বেও তিনি প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। সাহিত্যজগতেও তাঁর খ্যাতি ছিল সমধিক। তাঁর রচিত বহু পুস্তক ছিল মননশীল, ব্যঙ্গাত্মক ও সাহিত্যরসে পূর্ণ। ১৯৮১ সালে তিনি যখন নির্বাচনী প্রচারে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর পিছনে ছিল নিজের শক্তিশালী সমাজতন্ত্রী দল। নির্বাচনী প্রচারে তিনি সংস্কারের (Reforms) কর্মসূচীকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি দ্বিতীয় ব্যালটে ভালভাবে জয়লাভ করে নিজের চির-পরাজিত প্রার্থীর দুর্নাম দূর করেছিলেন। জাক্ চিরাকের দক্ষিণপন্থী প্রধানমন্ত্রীর আমলেও তিনি নিজেকে অভাজনদের (underprivilleged) প্রতিভূ হিসেবে নিজ ভাবমূর্তি বজায় রখেছিলেন।

ভিন্‌সেন্ট রাইটের মতে, "President Mitterand was a strange mixture, As an orator he was outstanding, lacing his lyricism and brooding romanticism with literary allusion and acerbic wit gentle irony and bitter sarcasm. As a debator, however, he was weak, hesitant, defensive, over-personal and sometimes gratuitously wounding. Mitterand was also the teacher, the poet, the author and the Prophet. ... There are touches of De Gaulle in Mitterand – the

isolation, the obstinacy, the ambition, the aloofness, the haughtiness, the ingratitude towards his friends, the ruthlessness towards his rivals, the disdain for his enemies, the moral distaste for great wealth, the pretension to be above politics, while carefully and even cynically indulging in them, the skilful manipulation of languages, the vision and the quite taste for publicised matrydom"

কিন্তু এসব সত্ত্বেও মিতরঁ তংার পূর্বসূরীদের থেকে অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা। সামাজিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষাদীক্ষা, পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মিতরঁ এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। প্রথমত, মিতরঁর কাজের ধরন অন্য তিনজনের থেকে আলাদা। গিসকার্দ নিজের লোকেদের নিয়েই এলিজি ভবনে কাজ করতেন। কিন্তু মিতরঁ একাই কাজ করেন অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষ মারফৎ কাজ করে থাকেন। দ্বিতীয়ত, মিতরঁর কার্যধারা দ্য গল অনুসারী - distant, autocratic, olympian। তৃতীয়ত, মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে তিনজন থেকে এক স্বতন্ত্র ধরনের। দ্য গল যেখানে ছিলেন নৈরাশ্যবাদী, গিসকার্দ ছিলেন সমকালীনবাদী, পঁম্পিদু ছিলেন নিয়তিবাদী, মিতরঁ সেখানে অতি সাবধানী, সন্দেহমন নিয়ে মানুষ সম্পর্কে গভীর আশাবাদী ব্যক্তি। চতুর্থত, ফরাসী সমাজ সম্পর্কেও মিতরঁর আছে ভিন্ন ধারণা। দ্য গলের কাছে ফরাসী সমাজ ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিভেদকারী শক্তিতে পূর্ণ। পঁম্পিদু বিশ্বাস করতেন যে ফরাসী সমাজের উপরিভাগে উত্তপ্ত উত্তেজনার নিচে রয়েছে ফরাসী সমাজের সুস্থিত ভিত্তি যা সংস্কারের ফলে বিঘ্নিত হতে পারে। গিসকার্দ ফরাসী সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে আশাবাদী থেকেও শেষপর্যন্ত সংকীর্ণ রক্ষণশীলতা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। মিতরঁ ফরাসী সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তিতে বিশ্বাসী এবং পৃথিবীতে ফ্রান্সের প্রাধান্য সম্পর্কে অহং মনোভাব প্রদর্শন করেন। পঞ্চমত, মিতরঁ দ্য গলপন্থী নন, গিসকার্দের মতো রক্ষণশীল নন। তিনি মার্কসবাদী না হলেও তিনি মানবতাবাদী, মানবিক, সার্বজনীন, সমাজতন্ত্রী ও ফরাসী সাধারণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। বলা হয় যে, Mitterands heroes were not Marx, Engels and Lenin but Jules Ferry, Jean Jaures and LeoBlum. লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে তাঁর তিন পূর্বসূরি থেকে মিতরঁ ভিন্নমতাবলম্বী। দ্য গলের লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐক্য ও পৃথিবীতে ফ্রান্সের মর্যাদা স্থাপন। পঁম্পিদুর লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের অর্থনীতির আধুনিকীকরণ। গিসকার্দ দস্তাঁই-এর লক্ষ্য ছিল এক মুক্ত বহুত্ববাদী সমাজ গঠন। মিতরঁর লক্ষ্য পৃথিবীতে ফ্রান্সের গৌরবজনক ভূমিকা পালনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের চারজন রাষ্ট্রপতির মধ্যে সাদৃশ্যও আছে। ভিনসেন্ট রাইটের মতে "The four men also have much in common, Mitterand shares in predecessors' qualities of intellectual ability political sensitivity and personal courage ... the case of Mitterand is more interesting. Until his election in May 1981 he was the most consistent and persistent critic of the political institutions of the Fifth Republic and denounced with genuine anger the Presidential drift of the regime which he considered to be antirepublican. Yet in his very first utterances as the President of the Republic he confessed that the [political] institutions were not made with him in mind. But they are well made for him."

অর্থাৎ ক্ষমতায় আসার আগে মিতরঁ ছিলেন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবৃদ্ধিকরণের বিরুদ্ধে, কিন্তু ক্ষমতায় এসে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবৃদ্ধিকরণের পক্ষে। ক্ষমতার আগে ও পরে ছিল মিতরঁর-দুই ব্যক্তিত্ব ও দুই নীতি।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে চারজন ফরাসী রাষ্ট্রপতির মধ্যে প্রথম রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্য গল-এর যুগকে সামরিক-মেজাজের (militarism) যুগ বলা যায়। দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি পঁম্পিদুর রাজত্বকালকে জনতা-মেজাজের (populism) যুগ বলা যেতে পারে। তৃতীয় রাষ্ট্রপতি গিসকার্দ-দেস্তাঁই-এর যুগ কারিগরী দক্ষতার (technocracy) যুগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এই যুগ বৈশিষ্ট্যগুলি রাষ্ট্রপতি পদে আসীন বিভিন্ন ব্যক্তির কাজের ধরন ও শৈলীর উপর চিহ্নিত।

একই রাজনৈতিক কাঠামোয় রাষ্ট্রপতি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ধরন (Personality and style) দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনায় নিজস্ব ছাপ রাখতে পারেন এই ব্যবস্থা পরিচালনায় নিজস্ব ছাপ রাখতে পারেন এই ব্যবস্থা ফ্রান্সে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রয়েছে।

১০৬.৯ মন্ত্রিসভা — সরকারের অন্যমুখ

ফরাসী মন্ত্রিসভা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের শাসনবিভাগ হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করে ১৯৮৮ সালের পর। মিতরঁ রাষ্ট্রপতি থাকলেও তাঁর বিরোধী দলের নেতা চিরাক ১৯৮৬-৮৮ সালে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার কর্তৃত্ব স্বাধীন ও সুদৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। ১৯৮৮ সালের পর থেকে ফরাসী রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার মধ্যে কাজের ভাগাভাগি (job division) হয়ে যায় এইভাবে — প্রতিরক্ষা, ইউরোপীয় ও বৈদেশিক ব্যাপার দেখেন রাষ্ট্রপতি এবং আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ দেখেন প্রধানমন্ত্রী। এইভাবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ভারসাম্য (balance) বজায় রেখে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামো কাজ করে চলেছে। সুতরাং বলা যায় যে, বর্তমানে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে শাসনবিভাগে রাষ্ট্রপতিকেন্দ্রিকতার যুগের অবসান ঘটেছে। এই পরিবর্তনের আগেও অবশ্য পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতেন। বাস্তবিক পক্ষে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে ফরাসী প্রধানমন্ত্রীকে পাঁচ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সাধনের কাজ করতে হয়। যথা—(১) সরকারি নীতিসমূহের সঠিক সমন্বয় সাধন, (২) সরকারি আইন যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুমোদিত হয় তার জন্য পার্লামেন্টের সাথে যোগাযোগ রাখা, (৩) সরকারি কোয়ালিশনে বৃহৎ দলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, (৪) সরকারি কোয়ালিশনের বিভিন্ন শরিকের বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী দাবির মধ্যে মীমাংসা করা, (৫) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের মূল কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে কাজ করা।

ভিন্‌সেন্ট রাইটের মতে, "The Prime Minister provides a two-way channel between the President on the one hand and, on the other, the Government, Parliament, the ruling party coalition and the administration. In short, he initiates, coordinates, arbitrates, concentrates and implements. It is the Prime Minister who heads Frances vash administrative machine, his power over the implementation of politics is very much greater than that of the President of the Republic."

সংবিধানের ২০নং ধারায় বলা আছে যে— প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টের প্রতি দায়িত্বশীল থেকে দেশের শাসন-নীতি নির্ধারণ করবেন। রাষ্ট্রপতির ভূমিকা এই ক্ষেত্রে সংবিধানের ৫নং ধারা মতো অভিভাবকের ভূমিকামাত্র। ফরাসী মন্ত্রিসভার ভূমিকাই হল ফ্রান্সের শাসকের ভূমিকা। রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে মন্ত্রিসভার সভাপতি হলেও সাধারণত মন্ত্রিসভা বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী দেশ শাসনের নীতির জন্য জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন।

১০৬.১০ প্রধানমন্ত্রী

ফরাসী মন্ত্রিসভার গঠন অনুযায়ী প্রমাণিত হয়, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ফ্রান্সে মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত বা সংসদীয় সরকারের শাসন প্রবর্তিত আছে। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী "প্রিমিয়ার" (Premier) নামে অভিহিত। সাংবিধানিক অর্থে তাঁর ক্ষমতাও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতোই। ফ্রান্সের মন্ত্রিসভার অস্থায়িত্বে অভিজ্ঞতালব্ধ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রচয়িতাগণ এমন

ভূমিকা প্রধানমন্ত্রীর জন্য স্থির করেছেন যেখানে মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের মাত্রা অধিক হয়। 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী বিভাগীয় মন্ত্রীর স্বাক্ষরে গৃহীত হওয়া' — পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে অপরিহার্য বলে ধরা হয়েছে। এমতাবস্থায় ফরাসী প্রিমিয়ারের ভূমিকা সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতো হলেও নানা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার বাধায় ফরাসী প্রিমিয়ারের ক্ষমতা বাস্তবিকপক্ষে সীমিত, ভূমিকাও নিষ্প্রভ।

প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা গঠন করেন ও তিনি মন্ত্রিসভার সভায় পৌরোহিত্য করেন (৮নং ধারা)। পার্লামেন্টে তাঁর সরকারের ঘোষিত নীতির পক্ষে তিনি বক্তব্য রাখেন। সরকারি প্রশাসনকে তিনি পরিচালনা করেন। পার্লামেন্টে বিভিন্ন সদস্যগণের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রশ্নের উত্তর তাঁকেই মূলত দিতে হয়। তিনিই সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। জাতীয় সভায় তাঁর সরকারের প্রতি আস্থাসূচক প্রস্তাব তিনিই উত্থাপন করেন (৪৯ নং ধারা) যে সমস্ত ক্ষেত্রে সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ নেই, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনবোধে, রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে তিনি প্রতিরক্ষা দপ্তরের কমিটি ও কাউন্সিলরগুলির সভাপতি হিসেবে কাজ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী যদি স্পষ্টভাবে (authorised) হন, তা হলে কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সভায় সভাপতি হিসেবেও কাজ করেন (২১ ও ৯নং ধারা)। ৩৯ নং ধারা অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রিদের মত প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টে বিল (Bill) উত্থাপন করতে পারেন কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে অথবা পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুরোধে পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে, ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য আহূত বিশেষ অধিবেশন একমাত্র প্রধানমন্ত্রীই আহান করতে পারেন (২৯নং ধারা)। এ ছাড়া, সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সভা বাতিলের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ প্রয়োজন হয় (১২নং ধারা) এবং ১৬নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণের সাহায্যেই জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা জারি করেন।

১০৬.১১ মন্ত্রিসভা

ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা যৌথদায়িত্বশীলতা নীতির উপর গঠিত। সংবিধানের ১৩ ও ২০ নং ধারার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের যৌথ দায়িত্বের অর্থই প্রকাশ পায়। সংবিধানের ৩৮ নং ধারাতেও এই তাৎপর্যের সমর্থন পাওয়া যায়। ৩৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মন্ত্রিদপ্তরের নীতি রূপায়ণে বা পার্লামেন্টের সম্মতিসূচক অনুরোধ রাষ্ট্রীয় সভার সাথে আলোচনার পর মন্ত্রিসভা কোনও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অস্থায়ী আইন (ordinance) ঘোষণা করতে পারে। ২০নং ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সরকার অর্থাৎ মন্ত্রিসভা জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করবেন। এই প্রসঙ্গে পার্লামেন্টের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে ৪৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মন্ত্রিসভার সাথে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সভার নিকট সরকারের কর্মসূচী বা সাধারণ সরকারি নীতির দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করবেন। জাতীয় সভায় কোনও সরকারি প্রস্তাব পরাজিত হলে সমগ্র সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে। দ্বিতীয়ত, জাতীয়সভা সেন্সর-ভোটের মাধ্যমেও সরকারকে পরাজিত করার সুযোগ পায়। সেন্সর-প্রস্তাব আনয়নের জন্য জাতীয় সভার এক-দশমাংশ সদস্যের সই চাই ও আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ঐ সেন্সর-প্রস্তাবের উপর ভোটগ্রহণ করতে হয়। জাতীয় সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ঐ সেন্সর-প্রস্তাব অনুমোদিত হলে সরকার পদত্যাগ করে। কিন্তু ঐ প্রস্তাব পরাস্ত হলে ঐ একই অধিবেশনে একবার পরাস্ত -সেন্সর প্রস্তাবের স্বাক্ষরকারী-সদস্যগণ পুনরায় দ্বিতীয়বার কোনও সেন্সর-প্রস্তাব আনয়ন করতে পারেন না। তৃতীয়ত, মন্ত্রিসভায় আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সভায় সরকারের প্রতি আস্থা-প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। এই ধরনের প্রস্তাবের উপর যদি কোন সেন্সর-প্রস্তাব বিরোধী-পক্ষ হতে না আসে তা হলে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত আস্থাসূচক প্রস্তাব